THOSE WERE THE DAYS

Dr. Dipak kumar Biswas

Those were the days six decades ago
In the early sixties or nearly so
Which I spent with immense pleasure
And a jocund mood beyond measure.

Those were the days that always brought
A hefty thirst for knowledge to a taught
That helped his life reach the top
Culminating to a height never to stop.

Those were the days when a healing touch
Of loving care of a mother's clutch
Helped us sprout and grow as a true educand
And rise in true spirit of love of motherland.

Those are the days we cann't but tread
Down the memory lane that spread
With a pleasing fervour over the years
Passing by the days of learning without tears.

The days still bring us relief
And refresh our thought as if
Motherly love and care steer us through
The odds of life that blissfully brew
In course of stuggles that help negotiate
All bents of various shades as yet.

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু স্মৃতি ও কিছু বিশ্লেষণ

– অবনী জোয়ারদার (প্রাক্তনছাত্র)*

্যমিক স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে যেদিন আমি কলেজের গণ্ডিতে প্রবেশ করার অধিকারপত্র দিনের সেই সময়টা আজও বড্ড বেশী মনে পড়ে। বন্ধুবান্ধবরা সবাই এক হয়ে নানা আলোচনার ালয় জীবনের ভাল লাগা, নানা ভালবাসার বিষয়গুলির আলোচনার ফাঁকে প্রায় সবাই আমরা ফেলেছিলাম। বিচ্ছিন্নতা যে বেদনার জন্ম দেয় সেদিন আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করি। আজ এত যখন আমরা স্কুলের সামনে দিয়ে যাই, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলেই সেদিনকার কথা বড় বেশী ড়ে। মনে পড়ে শিক্ষকমশাইদের কঠোর অনুশাসন, অকৃপণ প্রীতি ও অনুরাগের নানা ঘটনাকে।

্যন্ত গ্রামের এক ছেলে হিসাবে যেদিন আমি কলেজে প্রথম প্রবেশ করি, সেদিন অন্য কিছু নয়, শুধু ৎ কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের বৃহদাকার স্তম্ভগুলি, মহাবিদ্যালয়ের বিশাল উচ্চতার ঘরগুলি কলেজ ভবনটার বিশালত্ব ও স্থাপত্য বৈচিত্র আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ক মহাশয়, বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপকমন্ডলী এবং উচ্চতর ক্লাসে পাঠরত ছাত্র–ছাত্রীদের সঙ্গে নানা য় পড়ি। অধ্যক্ষ মহোদয়ের বজ্রকঠোর অনুশাসন, অধ্যাপকমন্ডলীর সহৃদয় ভালবাসা এবং উচ্চতর ছাত্রীদের অকৃপণ সহযোগিতা আমার জীবনের সঞ্চয়ের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

জ আমার মনে হয় বিশালাকার কলেজ ভবনের বিশালত্বের অভ্যন্তরে শুধু ভবনটাকে স্থায়িত্ব টাই ছিল না, ছিল ছোট একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এক অতি সাধারণ ছাত্রের মানসিকতার উত্তরণ য়াস। আজকের দিনের নতুন নতুন কলেজভবনগুলোকে দেখলে মনে হয় সেখানে ছাত্র–ছাত্রীদের টানোর চেষ্টা আছে, তাদের মনের প্রসারতা বাড়িয়ে বিশালত্বকে অনুভব করার কোনো চেষ্টাই

মার কলেজ- জীবনের একটা ঘটনার কথা আমি শত চেষ্টাতেও ভুলতে পারিনা। ঘটনাটি হচ্ছে এই গলীন অধ্যক্ষ ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়; কলেজের সামনের ফুলের বাগান থেকে একটি ছাত্র একটি ছিল এবং অধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্রটিকে দশটাকা জরিমানা করেন এবং তার জরিমানার নির্দেশপত্রটি সব ছাত্রীদের পড়িয়ে শোনানো হয়। এই ঘটনা থেকে আমার মনে হয়েছিল কলেজ ভবনটি এবং ছপালার প্রতি অধ্যক্ষ মহাশয়ের অপরিসীম ভালবাসা এবং তার সংরক্ষণের জন্য সীমাহীন মমত্ববোধ বনের ঘটনা এবং এই ধরনের পদক্ষেপ আজকের দিনে প্রায় অকল্পনীয়।

ক্ষাজগতের নানা অবক্ষয়ের কথা আমরা প্রায়শ:ই শুনি। কথাটির ভিতরে যে অনেক পরিমাণে হ সে সম্বন্ধে অনেকেই নি: সন্দেহ। যে ক্ষেত্রে অবক্ষয়টা সবথেকে বেশী প্রতীয়মান– সেটা হল কতা। আজকের দিনে যথেষ্ট বিজ্ঞ অধ্যাপকমন্ডলীর অভাব নেই। অভাব আছে শুধু উৎসুক , ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নতুন কিছু জানার, নতুন কিছু করার এবং প্রচলিত পথে সমাধান না করে নতুন পথ অন্বেষণের চেষ্টার। যেদিন আমরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঔৎসুক্য, নতুন ভাবনার এবং মূলক মনোভাবের সন্ধান পাব-সেদিন থেকেই ছাত্র মানসিকতার পরিবর্তন আসবে।

অপচেষ্টা করে। এ জিনিসটাকে দুর করে যতদিন না ওদের আমরা সুস্থ মনের ছাত্র করে গড়ে তুলতে পারি, ততদিন আমাদের ভুগতেই হবে। আমাদের সময়ে আমরা ভাবতেই পারতাম না যে নানা অসদুপায় অবলম্বন ক'রে– এমনকি অর্থের বিনিময়ে ছাত্র ভর্তি করে মহাবিদ্যায়ের ছাত্র সংগঠনগুলোর শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো যায়। এইসব করে শুধু ছাত্রছাত্রীদেরই নয়, ভাবীকালের নাগরিকদেরও বিকৃতমনস্ক করে তোলা হচ্ছে।

এখনকার দিনের পঠনপাঠনের উদ্দেশ্য আগেকার দিনের পঠনপাঠনের উদ্দেশ্য থেকে অনেকটাই সরে এসেছে এবং আমি বলব এটাকে বাস্তবমুখী করার চেষ্টা হচ্ছে। অধীত বিষয়ের উপর ব্যুৎপত্তি লাভই আজকের দিনের বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনার শেষ কথা নয়। লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগকৌশলটাও জানা জরুরী। তার থেকেও বেশী জরুরী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এমন একটা মানসিকতা তৈরী করা যাতে তারা লব্ধজ্ঞানের প্রয়োগ কুশলতায় আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পারে এবং বিশ্বের দরবারে নিজেদের চাহিদা বাড়াতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরা হচ্ছে যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ ফসল। এই ফসল যদি বিশ্বের দরবারে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে বুঝতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ভিতরে এবং শিক্ষাব্যবস্থাতে কোনো গলদ আছে। যত দ্রুত আমরা গলদগুলো দুর করতে পারবো ততই মঙ্গল আমাদের।

[*লেখক বর্তমানে কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক]

What Quran says:

There are verses in the Quran that were called the 'Ten Commandments' or the ' Ten Instructions' by some scholars due to containing ten great commandments to mankind by Allah. These verses can be found in two places in the Qur'an.
The First: In Surat Al An'aam, Allah says:
(Say (O Muhammad): "Come, I will recite what your Lord has prohibited you from:

1. Join not anything in worship with Him;
2. be good and dutiful to your parents;
3. kill not your children because of poverty" – We provide sustenance for you as well as them –
4. "Come not near Al-Fawahish (great sins and illegal sexual intercourse) whether committed openly or secretly;
5. and kill not anyone whom Allah has forbidden except for a just cause (according to Islamic law). This He has commanded you with that you may understand.
6. And come not near to the orphan's property except to improve it until he or she attains the age of full strength;
7. and give full measure and full weight with justice" – We burden not any person, but that which they can bear –
8. "And whenever you give your word (i.e. judge between men or give evidence), say the truth even if a near relative is concerned,
9. and fulfill the Covenant of Allah. This He commands you that you may remember.
10. And verily, this (i.e. Allah's Commandments mentioned in the above two Verses) is my straight path, so follow it, and follow not (other) paths, for they will separate you from His path. This He has ordained for you that you may become Al-Muttaqoon (the pious.)[1]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু স্মৃতি ও কিছু বিশ্লেষণ

– অবনী জোয়ারদার (প্রাক্তনছাত্র)*

মাধ্যমিক স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে যেদিন আমি কলেজের গণ্ডিতে প্রবেশ করার অধিকারপত্র পেলাম, সেদিনের সেই সময়টা আজও বড্ড বেশী মনে পড়ে। বন্ধুবান্ধবরা সবাই এক হয়ে নানা আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যালয় জীবনের ভাল লাগা, নানা ভালবাসার বিষয়গুলির আলোচনার ফাঁকে প্রায় সবাই আমরা চোখের জল ফেলেছিলাম। বিচ্ছিন্নতা যে বেদনার জন্ম দেয় সেদিন আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করি। আজ এত বছর পরেও যখন আমরা স্কুলের সামনে দিয়ে যাই, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলেই সেদিনকার কথা বড় বেশী করে মনে পড়ে। মনে পড়ে শিক্ষকমশাইদের কঠোর অনুশাসন, অকৃপণ প্রীতি ও অনুরাগের নানা ঘটনাকে।

প্রত্যন্ত গ্রামের এক ছেলে হিসাবে যেদিন আমি কলেজে প্রথম প্রবেশ করি, সেদিন অন্য কিছু নয়, শুধু কলেজ অর্থাৎ কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের বৃহদাকার স্তম্ভগুলি, মহাবিদ্যালয়ের বিশাল উচ্চতার ঘরগুলি এবং সমগ্র কলেজ ভবনটার বিশালত্ব ও স্থাপত্য বৈচিত্র আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ফাঁকে অধ্যক্ষ মহাশয়, বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপকমন্ডলী এবং উচ্চতর ক্লাসে পাঠরত ছাত্র–ছাত্রীদের সঙ্গে নানা ভাবে জড়িয়ে পড়ি। অধ্যক্ষ মহোদয়ের বজ্রকঠোর অনুশাসন, অধ্যাপকমন্ডলীর সহৃদয় ভালবাসা এবং উচ্চতর ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের অকৃপণ সহযোগিতা আমার জীবনের সঞ্চয়ের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

আজ আমার মনে হয় বিশালাকার কলেজ ভবনের বিশালত্বের অভ্যন্তরে শুধু ভবনটাকে স্থায়িত্ব দেওয়ার চেষ্টাই ছিল না, ছিল ছোট একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এক অতি সাধারণ ছাত্রের মানসিকতার উত্তরণ ঘটানোরও প্রয়াস। আজকের দিনের নতুন নতুন কলেজভবনগুলোকে দেখলে মনে হয় সেখানে ছাত্র–ছাত্রীদের স্থানাভাব মেটানোর চেষ্টা আছে, তাদের মনের প্রসারতা বাড়িয়ে বিশালত্বকে অনুভব করার কোনো চেষ্টাই নেই।

আমার কলেজ- জীবনের একটা ঘটনার কথা আমি শত চেষ্টাতেও ভুলতে পারিনা। ঘটনাটি হচ্ছে এই রকম –তৎকালীন অধ্যক্ষ ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়; কলেজের সামনের ফুলের বাগান থেকে একটি ছাত্র একটি পাতা ছিঁড়েছিল এবং অধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্রটিকে দশটাকা জরিমানা করেন এবং তার জরিমানার নির্দেশপত্রটি সব ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে শোনানো হয়। এই ঘটনা থেকে আমার মনে হয়েছিল কলেজ ভবনটি এবং কলেজের গাছপালার প্রতি অধ্যক্ষ মহাশয়ের অপরিসীম ভালবাসা এবং তার সংরক্ষণের জন্য সীমাহীন মমত্ববোধ ছিল। এই ধরনের ঘটনা এবং এই ধরনের পদক্ষেপ আজকের দিনে প্রায় অকল্পনীয়।

শিক্ষাজগতের নানা অবক্ষয়ের কথা আমরা প্রায়শ:ই শুনি। কথাটির ভিতরে যে অনেক পরিমাণে সত্যতা আছে সে সম্বন্ধে অনেকেই নি: সন্দেহ। যে ক্ষেত্রে অবক্ষয়টা সবথেকে বেশী প্রতীয়মান– সেটা হল ছাত্র মানসিকতা। আজকের দিনে যথেষ্ট বিজ্ঞ অধ্যাপকমন্ডলীর অভাব নেই। অভাব আছে শুধু উৎসুক ছাত্রছাত্রীদের, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নতুন কিছু জানার, নতুন কিছু করার এবং প্রচলিত পথে সমাধান না করে সমাধানের নতুন পথ অন্বেষণের চেষ্টার। যেদিন আমরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঔৎসুক্য, নতুন ভাবনার এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের সন্ধান পাব-সেদিন থেকেই ছাত্র মানসিকতার পরিবর্তন আসবে।

দিশাহীন ছাত্রসমাজ অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকমন্ডলীর দিশা দেখানোর প্রয়াসকে অবজ্ঞা করে নিজেরা একরকম বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দেয় এবং সহপাঠী ও সহপাঠিনীদের মধ্যে একধরনের বীরত্ব প্রকাশের

অপচেষ্টা করে। এ জিনিসটাকে দূর করে যতদিন না ওদের আমরা সুস্থ মনের ছাত্র করে গড়ে তুলতে পারি, ততদিন আমাদের ভুগতেই হবে। আমাদের সময়ে আমরা ভাবতেই পারতাম না যে নানা অসদুপায় অবলম্বন ক'রে– এমনকি অর্থের বিনিময়ে ছাত্র ভর্তি করে মহাবিদ্যায়ের ছাত্র সংগঠনগুলোর শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো যায়। এইসব করে শুধু ছাত্রছাত্রীদেরই নয়, ভাবীকালের নাগরিকদেরও বিকৃতমনস্ক করে তোলা হচ্ছে।

এখনকার দিনের পঠনপাঠনের উদ্দেশ্য আগেকার দিনের পঠনপাঠনের উদ্দেশ্য থেকে অনেকটাই সরে এসেছে এবং আমি বলব এটাকে বাস্তবমুখী করার চেষ্টা হচ্ছে। অধীত বিষয়ের উপর ব্যুৎপত্তি লাভই আজকের দিনের বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনার শেষ কথা নয়। লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগকৌশলটাও জানা জরুরী। তার থেকেও বেশী জরুরী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এমন একটা মানসিকতা তৈরী করা যাতে তারা লব্ধজ্ঞানের প্রয়োগ কুশলতায় আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পারে এবং বিশ্বের দরবারে নিজেদের চাহিদা বাড়াতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরা হচ্ছে যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ ফসল। এই ফসল যদি বিশ্বের দরবারে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে বুঝতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ভিতরে এবং শিক্ষাব্যবস্থাতে কোনো গলদ আছে। যত দ্রুত আমরা গলদগুলো দূর করতে পারবো ততই মঙ্গল আমাদের।

[*লেখক বর্তমানে কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক]

What Quran says:

There are verses in the Quran that were called the 'Ten Commandments' or the ' Ten Instructions' by some scholars due to containing ten great commandments to mankind by Allah. These verses can be found in two places in the Qur'an.
The First: In Surat Al An'aam, Allah says:
(Say (O Muhammad): "Come, I will recite what your Lord has prohibited you from:

1. Join not anything in worship with Him;
2. be good and dutiful to your parents;
3. kill not your children because of poverty" – We provide sustenance for you as well as them –
4. "Come not near Al-Fawahish (great sins and illegal sexual intercourse) whether committed openly or secretly;
5. and kill not anyone whom Allah has forbidden except for a just cause (according to Islamic law). This He has commanded you with that you may understand.
6. And come not near to the orphan's property except to improve it until he or she attains the age of full strength;
7. and give full measure and full weight with justice" – We burden not any person, but that which they can bear –
8. "And whenever you give your word (i.e. judge between men or give evidence), say the truth even if a near relative is concerned,
9. and fulfill the Covenant of Allah. This He commands you that you may remember.
10. And verily, this (i.e. Allah's Commandments mentioned in the above two Verses) is my straight path, so follow it, and follow not (other) paths, for they will separate you from His path. This He has ordained for you that you may become Al-Muttaqoon (the pious.)[1]

A citadel of learning: in commemoration

-Vivekananda Sen
(English Hons)(1967-1970)

Time passes like anything. It's a continual flow and we joyride on it floating like tiny boats. Thousands of such boats are floating down to the sea of time—and the sea, now a placid sheet of waters, and now rippling with turbulent waves!

My time has passed through all such mixed experiences; and as I look back memories sweet n sour cloud round the days I spent long back in this citadel of learning standing so gaunt in her high Gothic grandeur.

It was on a cool shower-bathed morning in the late sixties, a boy still in his teens ventured into the precincts of this citadel, riding his bi-cycle, a Lilliput simply bemused at the imperial grandeur of Krishnagar Government College building, the name inscribed in a triangular fin atop the front facade of a mammoth structure. As I stepped up paving the sprawling stairs and stood on the porch, I felt I got lost in the maze of the Corinthian corridors of this illustrious seat of learning. And strangely enough as I looked round I truly felt I, a fledgling, am soon to learn the art of flying free in the boundless sky of knowledge per se.

And, then onward I grew up carrying with me that unique feeling of free flying and free trekking the more skies I scaled and the more terrains I scoured.

I feel so happy that, as an alumnus, I could get an opportunity of pouring out my adulation to my alma mater, Krishnagar Government College.

"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever."
— Mahatma Gandhi

কলেজের কথা কলেজের ব্যথা

প্রবীর কুমার বসু

তখন ছিল ইলেভেন ক্লাসের হায়ার সেকেন্ডারি। স্কুল গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে উচ্চ শিক্ষার পীঠস্থান কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি হলাম। যদিও এই প্রতিবেদনটি এই কলেজের প্রাক্তনী সংগঠনের স্মরণিকার জন্য লেখা, তবুও স্কুলের পড়াশোনাটা দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল তাই স্কুলটাকে বারে বারেই মনে পড়ে যায়। আমরা সি এম এস স্কুলে পড়তাম আর তার ঠিক পাশেই হল কৃষ্ণনগর কলেজ। উঁচুর দিকের ক্লাসে যখন উঠলাম তখন পড়াশোনার অমনোযোগী হলেই আমাদের স্কুলের শিক্ষক বৈদ্যনাথ ব্রহ্ম প্রায়ই বলতেন যে ঠিকভাবে পড়াশোনা না করলে কিন্তু উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রা করতে হবে। উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রা কথাটা তখন খুব চালু ছিল এবং মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি দিতেন বলেই খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনেও সেটা স্থান পেত। তবে আমাদের স্কুলের বৈদ্যনাথবাবু অবশ্য অন্য অর্থেই কথাটা ব্যবহার করতেন এবং তিনি বোঝাতে চাইতেন যে ভালো রেজাল্ট না করলে তখনকার দিনে কৃষ্ণনগরের একমাত্র কলেজ অর্থাৎ কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে পড়ার সুযোগ কিছুতেই জুটবে না এবং বাধ্য হয়েই তখন হয় শান্তিপুর, নয় নবদ্বীপ আর না হয় রাণাঘাটে যেতে হবে। তাই তাঁর স্নেহভরা ব্যঙ্গোক্তি আমাদের অনেক কেই পড়াশোনার মনোযোগ দিতে উৎসাহিত করত।

সে যাই হোক উচ্চশিক্ষার পীঠস্থানে আসার পর প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে। তাই কলেজের স্মৃতি রোমন্থনে আমার দুর্বল স্মৃতি কোনো কাজেই লাগবে না বলে ভিন্ন প্রসঙ্গে গেলাম। অনেকেই অবশ্য কলেজ অ্যালুমনির স্মরণিকায় স্মৃতিচারণমূলক লেখা লিখতে এবং অন্যদের দিয়ে লেখাতে ভালোবাসেন। তবে আমি একটু ভিন্ন মতের অনুসারী কেননা প্রেসিডেন্সি কলেজের অ্যালুমনির স্মরনিকা দীর্ঘদিন ধরে আমি হাতে পেয়েছি এবং পড়ে দেখেছি যে সেখানে স্মৃতিচারণমূলক কোনো লেখা তো থাকেই না বরং এত সিরিয়াস লেখা থাকে যা মনে হয়(অন্যদের খাটো না করেও বলা যায় যে) প্রেসিডেন্সি কলেজের পক্ষে সেটাই হল উপযুক্ত । এক কালে এই কলেজেই আইন পড়ানো হত এবং দীর্ঘকাল ধরেই এই কলেজটি মর্যাদার দিক দিয়ে প্রেসিডেন্সির পরে নিজের স্থান করে নিয়েছিল। দেড়শো বছরেরও কিছু বেশি সময় পার হয়ে যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে যে কলেজের গড়ন গঠন যে চৌহদ্দি নিয়ে শুরু হয়েছিল আজ তা অনেকটাই সঙ্কুচিত, এমনকি কলেজের সম্পত্তি নিয়ে অনেকেই অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছেন। এগুলো যেকোনো ব্যক্তিই কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে পরিদর্শনে এসে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। এ তো গেল সীমানার কথা। এবারে আসা যাক পড়াশোনার ব্যাপারে । আমাদের সময়ে কলেজ সংলগ্ন একটি প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার্স ছিল এবং তখনকার প্রিন্সিপালরা সেই কোয়াটারসেই থাকতেন। এখন তার যা হাল হয়েছে, সেটা বলতে শুধু কষ্ট লাগে না, লজ্জাও লাগে। গ্রামাঞ্চলে সেকালে কলেজ ছিল না বলে সুদূর করিমপুর, তেহট্ট, চাপড়া, নকাশিপাড়া, টাঁলিগঞ্জ থেকে বহু ছাত্র কৃষ্ণনগর কলেজে পড়তে আসত এবং তাদের তদারকির জন্য হস্টেল সুপার নিজেই

হস্টেল সংলগ্ন কোয়ার্টার্স–এ থাকতেন। এখন সেটা কার দখলে কেউ জানে না। আর এমন অবস্থাটা দীর্ঘ দেড় দুই দশক ধরেই চলেছে। সমাজ পরিবর্তনশীল, কিন্তু এই ধরনের পরিবর্তন বোধহয় সমাজের কোনো স্তরের মানুষের পক্ষেই কাম্য নয়।

বছর কয়েক আগে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতেই জানা গেল যে ভারতের পরিকল্পনা কমিশন এই পরিকল্পনা কালে দেশের ১০০ টি প্রাচীন কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করতে চায়। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও আগে যে কলেজটির জন্ম সেই কলেজটি নিশ্চয়ই প্রাচীনত্বের দাবি রাখতে পারে এবং সেই কারণেই কলেজটির বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ারও দাবি রাখে। দাবি থাকতেই পারে আর দাবি থাকলেই যে সেটা পূরণ হতেই হবে এমন কোনো কথাও নেই। তাই এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার জন্যে যেসব পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল তা নেওয়া হয়নি। বলাই বাহুল্য সেই সময় কিন্তু এ রাজ্যে বর্তমান যে সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে সেটা ছিল না। সেই সময়ে অনেক অনুরোধ উপরোধ করা হয়েছে, ফাইলের পর ফাইল তৈরি হয়েছে এবং পাঠানো হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি। একটা বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সেই ভাবে কোনো একটি শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাকে খুঁটিয়ে দেখার মতো এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার মতো কোনো পরিবেশ গত পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে কোনোভবেই দেখা যায়নি।

বলতে কুণ্ঠা নেই যে, ন্যাকের পীয়ার টিম মাঝে মধ্যেই আসে এবং তাদের কাছে কোনো একটি কলেজের নির্দিষ্ট মান অর্জন করার অন্যতম পূর্বশর্ত থাকে সেই কলেজে প্রাক্তনীদের কোনো সংগঠন আছে কিনা। অতীতে এমনই এক সন্ধিক্ষণেই এই কলেজের প্রাক্তনীদের সংগঠন গড়ে ওঠে। প্রাক্তনীদের সংগঠন থাকায় সেটা এই কলেজের নির্দিষ্ট সম্মান অর্জনে সহায়তা করে কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ তথা রাজ্য সরকারের সদর্থক ভূমিকা ছাড়া কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা যায় না। রাজনৈতিক রং নির্বিশেষে কেবলমাত্র শিক্ষার স্বার্থেই যে কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার জন্য তৎপর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল, কোনোদিনই সেই ধরনের কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। জানি না আগামী দিনে এই কলেজের ভবিষ্যত কী দাঁড়াবে। তবে প্রাক্তনীদের সংগঠনের তরফ থেকে এই কলেজকে সবদিকে দিয়ে উন্নত করে তোলার আন্তরিকতাপূর্ণ প্রয়াস চলতেই থাকবে।

মধ্যরাতে বালিয়াড়ি ডাকে

বিশ্বনাথ ভৌমিক

বালিয়াড়ি তাকে ডাক দেয় মধ্যরাতে –
সে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় –
কিন্তু চৌকাঠ তাকে বার হতে দেয় না কিছুতেই –
অনেক ঘুমের ওষুধ তার ওষুধ পাত্রে –
প্রতিরাতে সে এই ঘুমের সাম্রাজ্যে হাঁটে –
তার ঘুম ভেঙে যায় ঠিক মধ্য রাতে –
সে আকাশের কাছে তার ঠিকানা খোঁজে।

শিক্ষার এ পবিত্র অঙ্গনে

ভারতী দাস

এখানে এসেই মন নতজানু হয়
উদার বিস্তার এই জ্ঞানের মন্দিরে।
গভীর সুখের মতো ফিরে আসে
কৈশোর ও যৌবনের ফেলে আসা দিন।
তখন যা করিনি কখনও এখন অবলীলায়
বড় বড় ধাপগুলি স্পর্শ করি, শিহরিত হই।
এসব জ্ঞানের ধাপ আমাদের নিয়ে যায়
উন্মেষের শেষ উচ্চতায়।
অন্য অন্য আচার্য্য চৌধুরী, শশীবাবু অথবা শ্যামল বিকাশ,
বিষ্ণুবাবু, হেমবাবু কিংবা সুধীরবাবুর মতো
আচার্যের উদাত্ত গলায় মুখরিত হয় করিডোর।
আচার্যের হাতে ধরা জ্ঞানের বর্তিকা
অজ্ঞানের আঁধার কাটিয়ে
দীপ জ্বালে শত শত শিক্ষার্থীর মনে।
গেটের পাশের ওই উর্দ্ধমুখী প্রকাণ্ড শিরীষ
কী মায়া ছড়িয়ে দেয় আমাদের মনে।
সেও যেন বলতে চায়, মাথা তুলে দাঁড়াও এখানে–
সকল ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে জীবনকে রক্ষা করো স্নেহের ছায়ায়।
যখন বাইরে দেখি হানাহানি, হিংসা কিংবা রক্তের প্লাবন
এখানে দু'দণ্ড বসো, বুকভরে টেনে নাও
শিক্ষাঙ্গনের এই পবিত্র বাতাস,
উন্মুক্ত সবুজ মাঠে অবগাহন করো
প্রাণে মেখে উজ্জ্বল রোদদুর।
রাজনীতি, ছাত্র ভোট, এসবে কি পাবে?
এখানে এখনও বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিখা চির প্রজ্জ্বলিত
এখানে এলেই তাই জীবনের ঠিকঠাক দিশা খুঁজে পাবে।
মহান এ মাতৃক্রোড়ে যদি মাথা রাখো
জীবনের সব গ্লানি ধুয়ে মুছে যাবে।

পুনর্মিলনের গান –২০১৩–১৪

মঞ্জুলিকা সরকার

বসন্তের কোয়েলের কুহুতানে
পুরোনো বসন্তদিনের টানে
সমবেত মোরা কুসুমিত প্রাঙ্গনে
স্মরিতে সে সকল দিনে পুনর্মিলনে।।
সুশোভন অট্টালিকায় থামের বন্ধনে
সমাগত কত জ্ঞানী–গুণীজনে
বিজ্ঞানে–প্রজ্ঞানে সাহিত্য দর্শনে
প্রাণে প্রাণ যোগকরা স্নেহঝরা পাঠদানে
স্ফুরিত করেছে কত উন্মুখ কোরকে
বিকশিত কত শত শতদলে।
সেই পথের মনোহরা মালাখানি
কলেজমাতঃ তব পদতলে দিনু আনি
পুলকিত প্রাণে গানে গানে
মিলে যাওয়া কোয়েলের কুহুতানে।।
সম্রাজ্ঞী কলেজমাতঃ কেন তব বদন মলিন?
কেয়ূর কঙ্কন কেন ধূলতে বিলীন?
আজ দিন নয় গাহিবার বসন্তবাহার
হৃদয় রুদ্রবীণে উঠুক ঝঙ্কার প্রজ্বলিত হুতাশন সম দীপক রাগ।।
আজিকার দিন তাই প্রতিজ্ঞা নেবার
কণ্ঠে দুলাবই তব হীরকখচিত রত্নহার
কাঞ্চন কিরীট শোভিবে মাতঃ ললাটে তোমার।
সার্থক হবে কলেজ –বাসন্তী পূজা
আনন্দে পুলকে গাহিব মোরা বসন্তের গান
শিহরিত প্রাণে গানে গানে
মিলে যাবে কোয়েলের কুহুতানে
এই প্রাঙ্গণে গানে গানে।

স্মৃতিকথা

চিত্তরঞ্জন রায়

১৯৬১ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার কৃতকার্য হবার পর কৃষ্ণনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে প্রি ইউনিভার্সিটি কোর্সে পড়ার জন্য ভর্তি হলাম। নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী বিদ্যালয় শিক্ষাকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা হয় এবং কলেজীয় ২ বছরের বি.এ., বি.এস.সি–র পরিবর্তে ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়। প্রি–ইউনিভার্সিটি কোর্সটি একাদশ শ্রেণীর বিকল্প। সেই সময় সমস্ত বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চ–মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করতে না পারায়, স্কুল ফাইনাল ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় কোর্স চালু ছিল। যে সব বিদ্যালয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত তাদের ছাত্র–ছাত্রীরা নবম শ্রেণী থেকে কলা/ বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনার সুযোগ পেত। প্রি–ইউনিভার্সিটি কোর্সটি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের অথচ পঠনীয় বিষয় ছিল অনেক বেশি। ইংরাজী ১৫০, বাংলা ১০০, তিনটি নির্বাচিত বিষয় ৩০০, ঐচ্ছিক একটি বিষয় ১০০ । কলেজে শ্রেণী পাঠ বিদ্যালয়ের মতো নয় । বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে যেমন একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে, কলেজ সম্পূর্ণ তার ব্যতিক্রম, বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকেরা শ্রেণী পাঠদানেই ক্ষেত্রে উপস্থাপন / মুল্যায়ন ইত্যাদি করে থাকেন। কলেজে শিক্ষকরা অধিকাংশ ইংরাজীতে বিষয়গুলিকে পাঠদানেরই বেশি অভ্যস্ত ছিলেন। স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত বিদ্যালয় শিক্ষা মাতৃ ভাষার মাধ্যমে পড়ে আসার ফরে নতুন ছাত্রদের অধ্যাপকদের জ্ঞান গরিমার কাছে অকুল সাগরে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হালে পানি না পাওয়ার মত। ফল স্বরূপ, যা হবার তাই; নতুন বিষয়, নতুন পরিবেশ, তাই পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল করে উঠতে পারেনি অনেকেই। কলেজের অধ্যাপকরা বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture method) অবলম্বন করে পড়াতেন। ছাত্র–ছাত্রীরা কতটা নিতে পারল সেটা তাদের ভাবনার বিষয় ছিল না।

দীর্ঘ ৩৭ বছর শিক্ষকতা ও শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থেকে মনে হয়েছে সেই সময়ের প্রি–ইউনিভার্সিটি কোর্সটি ছিল অবৈজ্ঞানিক এবং কলেজের শিক্ষকদের পাঠদান প্রক্রিয়াটি ছিল ততোধিক অবৈজ্ঞানিক। রবীন্দ্রনাথের কথা প্রতিধ্বনিত করে বলতে পারি– 'আমরা নোট নিয়েছি, মুখস্থ করেছি, পাশ করেছি, বসন্তের দখিন হাওয়ার মতো শিক্ষা মনুষ্যত্বের কুঞ্জে কুঞ্জে পাতা ধরিয়ে ফুল ফোটাতে পারেনি। সেখানে সংগীত নেই, চিত্র নেই, আত্ম –প্রকাশের উপায় উপকরণ নেই। এ যে কত বড় দৈন্য তার বোধশক্তি পর্যন্ত আমাদের লুপ্ত হয়েছে।'

যাই হোক, একটি বছর কখন কেটে গেল বুঝতে পারিনি। সেই সময় কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ফনী ভূষণ মুখার্জী। খুবই শৃঙ্খলাপরায়ণ ব্যক্তিত্ব! টেস্ট পরীক্ষায় জনৈক ছাত্র অসদুপায় অবলম্বন করতে গিয়ে ধরা পড়লে তাকে টেস্ট পরীক্ষায় disallow করা হয়। এই নিয়ে প্রি–ইউনিভার্সিটিতে পড়া ছাত্ররা ক্লাস না করে বিক্ষোভ দেখালে তিনি সকলের পরীক্ষা বাতিল করবেন বলেছিলেন। যাই হোক পরবর্তীকালে তিনি সিদ্ধান্তটি বাতিল করে সকলের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরীক্ষার হলে অধ্যক্ষ মুখার্জী কেডস পড়ে আসতেন যাতে বিন্দুমাত্র শব্দে কারো লেখার বিঘ্ন না ঘটে। আর একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। অধ্যাপক দেবী প্রসাদ মুখার্জী কমার্শিয়াল জিওগ্রাফি পড়াতেন। অধ্যক্ষ মশায় পাশেই ইংরাজী ক্লাস নেবার জন্য বেরিয়েছেন, কোন কারণে দেবীবাবুর শ্রেণী কক্ষে আসতে কিঞ্চিত বিলম্ব হয়। তিনি নিদ্ধারিত শ্রেণীকক্ষে না ঢুকে প্রি–ইউসিভর্সিটি ক্লাসে ঢুকলেন। শ্রেণীকক্ষে অধ্যক্ষের ঢোকার পূর্বে বেশ গোলমাল হচ্ছিল। তার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী কক্ষ নীরব হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে দেবীবাবুর প্রবেশ। এবারে খুব শান্তভাবে দেবীবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি– "দেবীবাবু, আপনার কি জানা আছে বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে, সেখানে পূর্বে একটি মাছ বাজার ছিল। ছাত্ররা মনে হয় সেই সূত্রে গোলমাল করার উত্তরাধিকার পেয়েছে" দেবীবাবু মুচকি হাসলেন, তিনি শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করলেন।

সৌভাগ্যক্রমে, এই কলেজেই আমার স্নাতক পর্যায়ে পাঠ। আমি অর্থনীতির ছাত্র ছিলাম। প্রথমে ১৫জন ছাত্র–ছাত্রী (একজন ছাত্রী) অনার্সের ক্লাস শুরু করে। শেষ পর্যন্ত ৯(নয়) জন আমরা কোর্স সমাপ্ত করি। সহপাঠিরা

খুবই বন্ধু বৎসল ছিল। এদের ২/৪ জনের নাম না করে পারছিনা। যারা সেই ছাত্র সমাজের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিল। এরা হলেন সত্যেন গুহ পরবর্তী কালে আই.পি.এস. কানাই লাল বিশ্বাস, আই. এ.এস. পরিতোষ সমাদ্দার ডাব্লিউ.বি.সি.এস., দীপ্তী প্রকাশ পাল অধ্যাপক। এছাড়া সববিভাগের ছাত্রদের সঙ্গে ছিল নিবিড় বন্ধুত্ব, যা কিনা স্কুল জীবনে ঘটে না। পাশ কোর্সে যারা পড়তেন তাদের মধ্যে জয়দেব দের কথা ভোলার নয়। প্রতিবন্ধকতা জয় করে সে কৃতিত্বের সঙ্গে পাঠক্রম শেষ করে। আর একজনের কথা না বললেই নয় সে হল দীপক বিশ্বাস, ভাল লেখার হাত, সুবক্তা ও অত্যন্ত বন্ধু– বৎসল উত্তর জীবনে শিক্ষকতাকে বেছে নিয়েছিল। ডব্লিউ. বি.সি.এস/ আই.এ. এস পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েও শিক্ষকতাকেই জীবনের ব্রত হিসাবে বেছে নিয়ে চাকুরীকাল সমাপন করেছে আজও তার সঙ্গে দেখ হয়। সেই অমলিন হাসি সেই প্রীতি সম্ভাষণ।

যাদের কাছে পাঠ নিয়েছি তাদের সম্পর্কে দুই–চার কথা বলা প্রয়োজন। অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় বিনয় ভূষন পোদ্দার,ইংরাজীর শশীভূষণ দাশ, বাংলার সুধীর প্রসাদ চক্রবর্তী এরা সত্যিকারের উচ্চাঙ্গের শিক্ষক ছিলেন। সুধীর বাবুর বাংলা পড়ানোর দক্ষতা স্মরণে রাখার মতো। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে বলে তিনি বড় শিক্ষক, যিনি শ্রেণীকক্ষেই ছাত্রের পাঠ তৈরী করে দিতে পারেন। তার কাছে নেওয়া পাঠ মেঘনাদবধ কাব্য, মানসী, কথা–কাহিনী আজও স্মরণ বীণায় অনুরণিত হয়। শশীবাবু ইংরাজী কবিতা পড়াতেন, তার পঠন শৈলীতে একটা পরিষ্কার ছবি ছাত্র–ছাত্রীদের সামনে ভেসে উঠত। ছাত্র–ছাত্রীরা মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করত সেই সব গীতি কবিতার ছন্দময় নাচ ও গান। এই সময়ে অধ্যক্ষ ছিলেন অমিয় কুমার মজুমদার মহাশয় পরবর্তিতে তিনি পি.এস.সি–র সদস্য হন। জীবনে অনেক বাগ্মী দেখেছি, কিন্তু এমন সুললিত ভাষণ আজও কোথাও শোনার সৌভাগ্য হয়নি। কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অমিয় বাবুকে সুরেন ব্যানার্জির মতো বাগ্মী বলে উল্লেখ করেছিলেন। অধ্যাপক সুধীর বাবু দেশবন্ধু স্মৃতি পাঠাগারের একটি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমি সাক্ষাতে গেলে তিনি আমার নামটি বলে আমাকে হতবাক করে দিলেন। কলেজ ছাড়ার পর দীর্ঘদিন তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু এতদিনেও ছাত্রের নাম ভোলেননি। সেদিন শ্রদ্ধায় আমার মাথা আপনি নত হয়েছিল, নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম। উনি এখনও সাহিত্য সাধনায় নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। ওঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন। মহিলা কলেজে অনার্স না থাকায় বেশ কিছু মহিলা সহপাঠ নিতেন। এখন যেমন ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা । তখন কিন্তু এমনটি ছিল না, খুব সন্তর্পণে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হত। সম্বোধন ছিল 'আপনি'। এবার পোষাক সম্পর্কে বলি ছেলেদের পোষাক ছিল পাজামা ও শার্ট, কেও কেও ধূতি শার্ট পরতেন। মেয়েরা পড়তেন শাড়ি। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরা অবশ্যই ফুল–প্যান্ট শার্ট পরত। শিক্ষকেরা অধিকাংশ ধূতি পাঞ্জাবি বিশেষ করে প্রবীণরা, কম বয়েসি অধ্যাপকরা প্যান্ট–শার্ট পরতেন। কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত সেই সময়ে কনো মহিলা অধ্যাপিকা ছিলেন না।

কৃষ্ণনগর কলেজ তখন প্রাচীর বেষ্টিত ছিল না। সম্মুখস্থ খেলা মাঠে ছোট্ট একটি গ্যালারি ছিল। সেখানে ভোলাদার ক্যান্টিন ছিল, কলেজে ঢোকার মুখে প্রাচীন রেন–ট্রি আজও অমলিন, পাশেই ছিল ছাত্র সংসদের বস ঘর। লাইব্রেরী ও কলেজের পেছনে ছিল ছাত্রদের কমন রুম, অধ্যক্ষের ঘর । অফিস ঘরের উল্টোদিকে ছিল অধ্যাপকদের বসবার ঘর। তার পাশে মেয়েদের কমনরুম। কোনো ক্লাস শেষ হলে অধ্যাপকদের সঙ্গে মেয়েরা তাদের কমনরুমে চলে যেত। আবার অধ্যাপকরা যখন ক্লাসে আসতেন তার সঙ্গে সঙ্গে ওরা আসত। ছয়ের দশকে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি।

আজ প্রায় ৫০ বৎসর পরে স্মৃতি অনেকটাই ধূসর হয়ে এসেছে, তবুও কলেজ জীবনের সেই টুকরো স্মৃতিগুলি রোমন্থন করতে ভালতো লাগেই, মনে হয় এই যেন সেদিন কলেজের পাঠ শেষ করেছি। অনেক সতীর্থদের নাম হারিয়ে ফেলেছি। অনেকে আমাদের ছেড়ে অজানা পথে পাড়ি দিয়েছে। অনেক গুণী অধ্যাপকদের সংস্পর্শে এসেছি তারাও আজ সকলে নেই। তবুও স্মৃতির মনিকোঠায় তারা আজ চির জাগরুক।

সেই সকাল কবে আসবে

অসীমানন্দ মজুমদার (দর্শন বিভাগ) (১৯৮৭–১৯৯০)

সেই সকাল কবে আসবে ...
যেদিন বাতাসে থাকবে শুধু শিউলি ফুলের গন্ধ
যেদিন বন্ধ হয়ে যাবে সমস্ত বারুদের দুর্গন্ধ।
যেদিন বৃদ্ধ দীন দয়াল বারান্দায় বসে শুধু স্মৃতিচারণ করবে।

সেই সকাল কবে আসবে.....
যেদিন কবির কবিতায় শুধু মিলনের গান লেখা হবে,
যেদিন বিরহ ব্যথা থাকবে না কোনো সুরে
থাকবে শুধু অন্তরের ভালবাসা।

সেই সকাল কবে আসবে.....
যেদিন পুলিশ আর ঘুষ নেবে না,
অফিসে অফিসে দুর্নীতি হবে না,
যেদিন পেনশানের ফাইলে আর ধুলো জমবে না।

সেই সকাল কবে আসবে...
যেদিন বেকারত্বের জ্বালায় যুবকরা অফিসে অফিসে ঘুরবে না,
যেদিন পুলিশ আর লাঠি চার্জ করে
নিরীহ জনগণকে ছত্রভঙ্গ করবে না–
থাকবে না কোনো অন্যায়।

সেই নতুন সকাল কবে আসবে...
যেদিন অত্যাচারীর অত্যাচার বন্ধ হবে,
যেদিন প্রভাত পাখির গানে আকাশ মুখরিত হবে,
প্রেমিকের প্রাণ খোলা হাসিতে প্রিয়ার মন ভরে উঠবে।

সেই সকাল কবে আসবে...
যেদিন সকলের মনে থাকবে প্রশান্তি
যেদিন গিন্নিরা আর স্বামীদের সংসার চালাবার
অর্থনৈতিক কষ্টের কথা জানাবে না।

জানি না বন্ধু
সেই সকাল কবে আসবে...
যেদিন আমি তোমার দেখা পাব
নব যৌবন রাগে, তোমার প্রেমের আঙিনাতে।

এবারের বইমেলায় ২০১৩, প্রকাশিত হচ্ছে
কান্না - ঘাম - রক্তে ভেজা
কবিতার্ঘ্য
কিশোর

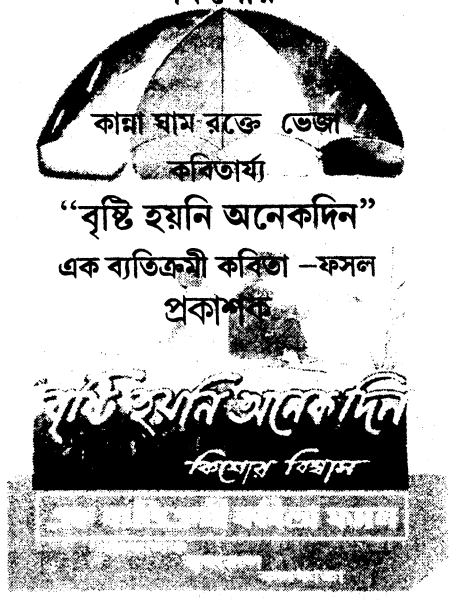

আমি-ই একদা লংকা দহন করেছি।
এখ'ন চূড়ায় বসে ভাবছি..............

সৌজন্যে ঃ সুহাস মিত্র (প্রাক্তনী)

স্মৃতিতে আজও প্রাণবন্ত

-প্রতিমা রায় মুখার্জী (প্রাক্তন ছাত্রী)

আজ কয়েক বছর হল আমি এই কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী । কিন্তু কীভাবে কলেজে এই দীর্ঘ সাতটা বছর পেরিয়ে এলাম তা বুঝতে পারিনি । মনে হয় এইতো সেদিন পাশ করলাম !

ইংরেজদের তৈরী আমাদের এই কলেজ । অধ্যাপক মহাশয়দের মুখে শুনেছি - আমাদের এই কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের মডেল একই । ইংরেজদের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অট্টালিকার সাথে গাড়ি-বারান্দা রাখা। আমাদের কলেজের মূল ভবনের পিছন দিকটা – অর্থাৎ ১০ নম্বর ঘরের সামনে যে গাড়ি-বারান্দা আছে তা' সত্যিই খুব সুন্দর এবং তা' অন্যান্য কলেজ থেকে স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে চিহ্নিত করে ।

যখন আমি একাদশ শ্রেণীতে এই কলেজে ভর্তির জন্য সুযোগ পাই - তখন ভাবছি, এ কী বিশাল ঘর ! এত বড় বড় ঘরে কী হয় ? – মনে নানান প্রশ্ন । অবশ্য তার আগে কলেজের কোনো এক বর্ষপূর্তি উৎসবে (১৯৯৬) আমি গিয়েছিলাম । তখনতো ভাবিনি - এই কলেজেই আমার পরবর্তী বিদ্যালাভের সুযোগ আসবে।

যাইহোক, ক্লাস শুরু হল, তার সাথে শুরু হল পরিচয়পর্ব । যেমন ডাঃ গোরাচাঁদ মণ্ডল, ইমানুল হক, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, ডাঃ সুতপা দাশগুপ্তা, গণপতিবাবু প্রমুখ অধ্যাপকদের সান্নিধ্যে শুরু হল তাদের কাছ থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ । এইভাবেই পেরিয়ে গেল XI & XII (1997-1999) পাঠ। তারপর এখানেই দর্শন (সাম্মানিক) নিয়ে স্নাতক শ্রেণীগুলিতে পড়ার সুযোগ হল এবং যখন চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাশ করলাম সে বছর একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটল । চালু হল আমাদের কলেজে দর্শনে স্নাতকোত্তর বিশেষ করে এই কারণেই, হয়তো আমার এম. এ. পড়ার ইচ্ছা পূর্ণ হল । একটা মজার কথা – এই বছর "নবীনবরণ" ছিল কাছে তৃতীয় বারের জন্য । সবাই বলল – "আগে সকলকে বরণ করতে হবে, তারপর তোমায় বরণ করব"। তা-ই হল । পেল একটি করে গোলাপ, আমি সবশেষে পেলাম একগোছা গোলাপ ।

আমরা যখন এম.এ. পড়ি, তখনও বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সান্নিধ্য পেয়েছি – যেমন ডাঃ শ্যামলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ মৃণালকান্তি চক্রবর্তী, ডাঃ নবকুমার নন্দী, দীপককুমার বাগচী, অঙ্গনা চক্রবর্তী, উৎপল মণ্ডল প্রমুখ । উল্লেখ্য, এই সকল মানুষের আদর্শ সত্যিই আজও আমাদের পথ চলার অনুপ্রেরণা দেয় । এর কারণ – এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা গ্রহণের সম্পর্ক নয় – একসাথে গল্পকথা, পারিবারিক খোঁজখবর নেওয়া, পিকনিক করা, নানান সেমিনারে যোগদান – সব মিলিয়ে ভীষণ জমজমাট ছিল সেই সময়টা । আর এম. এ. পাশ করার পরেও শেষ হয়নি এই কলেজে আমাদের যাওয়া-আসা । যে কোনও ব্যাপারে পড়ার সাহায্য নিতে যেতাম কলেজে এবং কলেজে সেমিনার, কালচারাল প্রোগ্রাম সহ নানান বিষয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতাম ।

তবে আজ আর সেইসব প্রায় নেই বললেই চলে । কারণ, আজ এই কলেজে সেই সময়কার বেশীর ভাগ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ এবং অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা আর নেই । তাই কলেজে গেলেই মনে হয় – "আমি প্রাক্তন" । কারণ, সেই আগের মতো "তুই", "আয়", "কেমন আছিস" ইত্যাদি শব্দগুলি আর শুনতে পাই না ।

তবুও সেই স্মৃতিকে পাথেয় করেই সারাজীবন চলতে চাই । আমার সকল শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমার ক্ষুদ্র স্মৃতিচারণ এখানেই শেষ করছি কবিগুরুর এই কথা উদ্ধৃত ক'রে – " দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে / যাবে না ফিরে" – অর্থাৎ, 'Estoperpetua' - তুমি দীর্ঘজীবী হও।

ফেলে আসা দিনগুলি

রসময় দত্ত , প্রাক্তনী (১৯৬৬–৬৭)

ফেলে আসা দিনগুলি মোর আজও প্রিয় আমার কাছে
ভাবলে সে সব দিনের কথা আজও আমার হৃদয় নাচে।
ছেষট্টিতে স্কুল ফাইনাল বালিয়াডাঙ্গা স্কুল থেকে
পাশটি করে আসতে হল এই কলেজে নাম লিখে।
ক্লাসের পাঠ শুরু হত ঘড়ির কাঁটা ধরে
প্রবেশ করা যেত না আর পাঁচ মিনিটের পরে।
চন্দ(১) স্যারের বাংলা ক্লাস ছন্দ জাগায় প্রাণে
ভুলতে নারি আজও আমি হৃদয় আমার টানে।
পিন পড়লেও যায় যে শোনা এমন নীরবতা
শ্রেণীকক্ষে করত বিরাজ–হত না অন্যথা।
রসিক দুলের পায়ের ধূলো আর বাঙালীর ওই হাতের আগুণ
অভাগীকে করল মহান– হল তাহার স্বপ্ন পূরণ।
উঠছে ধোঁয়া আকাশপাণে উঠছে ধোঁয়া ওই
নিমেষ হারা নয়ন মেলে শূণ্যে চেয়ে রই!
অভাগীর ওই স্বর্গ যে তার বিশ্বাসেরই পথ ধরে
দিল ধরা তারই কাছে আপণ পাখায় ভর করে।
এমনতরো উপস্থাপণ আর বর্ণনার ওই রঙিন, ছবি
কেমন করে করব প্রকাশ আমি তো আর নইকো কবি।
ফেলে আসা দিনগুলি মোর আজও প্রিয় আমার কাছে
পুণ্য স্মৃতির মিলনগীতি হৃদয়ে মোর তাই বিরাজে।
শ্যামল(২) স্যারের ইংরাজী ক্লাস-পড়ছে মনে মোর
দীপ–হাতে সেই মহীয়সী নারীর স্নেহডোর।
যুদ্ধের সেই বিভীষিকা –আহতদের ভিড়
মনে প্রাণে সেবার ব্রতে ধরে নি কোনও চিড়।
তার তুলনা নেইকো কোথাও; প্রাণ বাঁচানোর ব্রত
বিস্ময়েতে তাঁর স্মৃতিতে হৃদয় করি নত।
রমেন স্যারের ইংরাজী ক্লাস অতীতে চোখ রেখে
লিখছি আজি দু'চার কথা স্মৃতির পাতা থেকে।
অ্যালবাট্রসের মৃত্যু ঘিরে অভিশাপের সমাপতন
বিস্ময়েতে বিভোর হয়ে পড়ছি তারই প্রতিবেদন।
চতুর্দিকে জল আর জল; এক–ফোঁটা জল নাই
জাহাজটিতে ছিলেন যারা তাদের কী বালাই!
রসায়ণের চিন্ময় স্যার সবার প্রিয় আজব মানুষ
চুপসে যেত দুষ্টু ছেলের কেরামতির সকল ফানুস।
শ্রেণীকক্ষে আসতেন স্যার হাজিরা খাতা হাতে
নাম ডাকতেন অতি দ্রুত আপণ ভঙ্গিমাতে।
প্রক্সি দিয়ে কোনওমতেই পার পেত না তারা
অবাক হয়ে যেতাম আমি দেখে স্যারের ধারা।
রসায়ণের পাঠ্যবিষয় স্যারের জাদুর স্পর্শেতে
সরসতায় উঠত ভরে শ্যামলিমার হর্ষেতে।
ফেলে আসা দিনগুলি মোর আজও সবুজ আমার কাছে
অবুঝ আমার এ ভোলা মন ডুবতে যে চায় তারই মাঝে।
প্রিন্সিপাল ওই সিপিবি স্যার আজও আছে মনে
ডাকিয়েছিলেন স্কলারশিপের টাকা নেওয়ার দিনে।
'কোথায় বাড়ী, কী পরিচয়, কোন বা স্কুলের ছাত্র তুমি'
তাঁর প্রশ্ন শুনেই মনে হল স্যারের প্রিয়পাত্র আমি।
তাঁর কৌতুহলের সমীহ করে জানিয়েদিলাম সাথে
'বাড়ী গিয়ে ঐ টাকাটা দিব বাবার হাতে'।
'ঠিক বলেছ; বাবার হাতেই দেবে তুমি ঐ টাকাটা তুলি'
প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্যারের নিলাম চরণধূলি।
'পড়াশুনা করে তুমি দাঁড়াও নিজের পায়ে'
তাঁহার স্নেহের পরশ যেন লাগল আমার গায়ে।
ফেলে আসা দিনগুলি মোর আজও নবীন আমার কাছে
আনন্দ পাই এই ভরসায় জানি মোদের কলেজ আছে।
মোদক স্যারের আলোর ক্লাস, জ্যোতি (৭) স্যারের স্নেহের শাসন
মনে পড়ে সে সব কথা। অন্তরেতেই তাঁদের আসন।
নারায়ণ(৮) স্যার নিতেন আর সকলের স্মৃতি
ভাসা ভাসা পড়ছে মনে কালের এমন রীতি।
অশিক্ষক কর্মচারী ছিলেন যাঁরা যুক্ত তখন
জানি নাকো আজকে দিনে কোথায় তাঁরা আছেন কেমন।
ভালভাবেই কেটেছে দিন তাঁদের সহবত
প্রয়োজনে নিতাম মোরা সবার মতামত।
ভুলতে নারি নবীনবরণ দিনের অনুষ্ঠান
আর সে দিনের সেই মন মাতানো ভাটিয়ালি গান।
কৃষ্ণনগর কলেজ মোদের সেই সে সুদূর কাল থেকে
চলার গতি অব্যাহত যুগের সাথে তাল রেখে।
কতই স্মৃতির বন্ধনেতে পুন্য মোদের প্রতিষ্ঠান
ছাত্রধারার পথটি বেয়ে নিত্যনতুন অধিষ্ঠান।
আমার গর্ব এ শিক্ষালয়; নেইকো আমার খর্বতা
তৃপ্ত আমি, দীপ্ত আজি, ধন্য আমি সর্বথা।
কর্মজীবন শেষ হয়েছে তিনটি বছর আগে
'ভালো আছি' এই কথাটি ভাবতে ভালো লাগে।
ছাত্র ছিলাম এই কলেজের–বিরাট গর্ব আমার কাছে
প্রাক্তনীদের শরিক আমি; প্রাণের বীণায় সে সুর বাজে।

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে আমার কিছু অভিজ্ঞতা

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উচ্চ দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার ইচ্ছা ছিল । কিন্তু, পিতৃদেবের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে, ১৯৫৮ সালে সরকারী কলেজে কলা বিভাগে বাণিজ্য শাখায় ভর্তি হলাম । তখন অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রী পূর্ণচন্দ্র মুখার্জী, এম.এস.সি., পি.আর.এস.। অত্যন্ত ছাত্র-বৎসল, সহৃদয় ব্যক্তি । তাঁর চেষ্টায় আমি হাফ-ফ্রি স্টুডেন্টশিপ পেয়েছিলাম। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ কলা বিভাগে পড়তে পেরেছিলাম । সাংসারিক অনটনের কারণে, স্থানীয় একটি সরকারী স্কুলে কারিগরি বিভাগে একটি শিক্ষকতার কাজ নিই । কলেজে ভর্তির ছ'মাস পর প্রাতঃ বিভাগে ভর্তি হলাম । যে দুই বছর সরকারী কলেজে পড়েছিলাম তা থেকে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছিলাম এবং তা আমার পরবর্তী জীবনের পাথেয় হয়ে রয়েছে ।

অধ্যাপক শশীভূষণ দাশগুপ্ত আমাদের ইংরাজী পড়াতেন । তাঁর বাচন ভঙ্গী এতই সুন্দর ছিল যে তা যেন এখনও আমার কানে বাজে । বাংলা পড়াতেন ডাঃ ক্ষুদিরাম দাস । তাঁর পড়ানোর সময় গোটা ক্লাস মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতো । একবার একটি ঘটনায় তাঁর তেজস্বীতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল । আমরা হলঘরের উত্তর দিকের ঘরে ক্লাস করছি । আমাদের ক্লাসরুমের পাশ দিয়ে ছেলেরা হৈ হৈ করতে করতে চলেছে । ডাঃ দাসের পড়ানোয় খুবই অসুবিধা হচ্ছিল । তিনি তৎক্ষণাৎ ক্লাস রুম থেকে বেড়িয়ে ৫-৬ টি ছেলের নাম নিয়ে অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ জানালেন । অধ্যক্ষ সাথে সাথে সেই ছেলেগুলির কাছে কৈফিয়ত তলব করলেন এবং ডাঃ দাসের কাছে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দিলেন । ছেলেরা ক্ষমা চাওয়ায় ব্যাপারটা তখনকার মতো মিটে গেল ।

আমি যখন প্রাতঃবিভাগে পড়ি, সেই সময়কার একটা ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছিনা । আমাদের ক্লাসে জনা পাঁচেক মহিলা পড়তেন । কিছু বাজে ছেলে আমাদের ক্লাসে ছিল - যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইতো। ঐ সব বাজে ছেলেদের দ্বারা উত্যক্ত হবার ভয়ে, অধ্যাপকেরা ঘরে ঢোকার পরে, মহিলারা ক্লাসে এসে বসতেন । যে বেঞ্চটিতে তারা সাধারণত বসতেন সেটিতে কোন কারণে দুটি পেরেক খাঁড়া হয়ে ছিল । অধ্যাপক ক্লাসে ঢুকলে যথারীতি মেয়েরা নির্দিষ্ট বেঞ্চে বসার উদ্যোগ নিলেন। ব্যাপারটা আমার নজরে পড়ায়, আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "স্যার, ঐ বেঞ্চটিতে দুটো বড় বড় পেরেক উঠে আছে"। অধ্যাপক নিজে উঠে এসে কাছ থেকে বেঞ্চটির অবস্থা দেখে মেয়েদের অন্যত্র বসার জন্য বললেন । একটা দুর্ঘটনা এড়ানো গেল । কিন্তু, আমার কয়েকজন ছাত্রবন্ধু আমার উপর প্রচণ্ড ভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং পরে আমার উপর যৎপরোনাস্তি গালিগালাজ বর্ষণ শুরু করলো । পরে ঐ মেয়েরা আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে । আমার মনে আছে, এঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল – শ্রীমতী মীরা সান্যাল – যিনি এই কলেজ থেকে পাশ করে শক্তিনগর গার্লস স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন । আমাদের সময়ের ছেলেমেয়েরা এখন কে কোথায় আছেন, কে কী করছেন জানিনা । সেইসব দুষ্টু ছেলেরা নিশ্চয়ই তাদের তখনকার হঠকারী কাজের জন্য এতোদিনে নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন এবং নিজেদের ছেলে বা নাতিদের তেমন বিপজ্জনক মজা করার উৎসাহ জোগান না ।

প্রাক্তনী সংসদের সম্পাদক একদিন বললেন যে, পুনর্মিলনের দিন স্মৃতিচারণের যথেষ্ট সুযোগ থাকে না । তাই একটা লেখা স্মরণিকার জন্য দিলে খুব ভালো হয় । অনেক ঘটনার মধ্যে সামান্য কিছু কথা তুলে ধরলাম । ইদানীং কালে মেয়েদের হেনস্থা হবার যে প্রাত্যহিক খবর পাই তাঁর তুলনায় সেদিনের ঘটনা আজ নিতান্তই তুচ্ছ বলে বোধ হলেও – সেদিনও যেমন তা' নিন্দনীয় ছিল আজও তেমন ঘটনা নিন্দার যোগ্য ।

১৯৬০-৬১ সালে কলেজ ছেড়েছিলাম । পরে Cub Master Training নিলাম । স্কুলে ক্লাব প্যাক তৈরী করলাম। স্কাউট গ্রুপ আগেই ছিল । কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলে দুজন প্রেসিডেন্ট স্কাউট তৈরী হল । এঁদের নাম সর্বশ্রী সঞ্জীব বাগ ও চঞ্চল প্রামাণিক । এঁদের মধ্যে সঞ্জীব এন. সি. সি. -তে "সি. সার্টিফিকেট" পেয়েছিল । তখন ইস্টার্ন জোনের মেজর জেনারেল নিজে সরাসরি সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পদে ওকে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু ওর মা-বাবা রাজী হলেন না । ছেলেটি টি. ভি. মেকানিকের কাজ জানতো ও অপারেশন জানতো । সেই সূত্রে সে ইন্ডিয়ান মিলিটারি সার্ভিসে সরাসরি সুযোগ পেয়ে যায় । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ছেলেটি হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা যায় । এই ঘটনায় আমি ভীষণভাবে মর্মাহত হই । এই ছেলেটির জন্য আমি ১৯৭৬ সালে বাধ্যতামূলক ফার্স্ট এইড ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ পাই – যে ট্রেনিংটা মাধ্যমিক স্তরে ফিজিক্যাল এডুকেশন পরীক্ষায় কাজে লাগতো । আমি নদীয়া জেলার করিমপুর, শিকারপুর, চাপড়া, কল্যাণী, হরিণঘাটা প্রভৃতি জায়গায় ফার্স্ট এইড ট্রেনিং শুরু করতাম। ছেলেরা আনন্দ পেতো, আমি নিজেও খুব আনন্দ পেতাম । এর পর কৃষ্ণনগর সেন্ট জন্স এম্বুলেন্স অরগানাইসেশন -এর স্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্র তৈরী হল । আমাদের কাজ ছিল বিভিন্ন হাসপাতালে গাড়ী করে রোগী আনা-নেওয়া করা। এই কাজের মধ্য দিয়ে চরম আনন্দ ও উৎসাহ পেতাম ।

- দিলীপ মুখার্জী (প্রাক্তনী)

ঊনিশ পঁয়ষট্টি - আটষট্টির কৃষ্ণনগর কলেজের বোগেন সম্প্রদায় ও অহৈতুকী বৃক্ষ পত্রিকা

–অমর সিংহরায়

ইদানিং বোগেনগুরু আছ কোথায়?
কোথায় তোমার মৌজা সাকিন?
শুনেছি কোচবিহার নদিয়া কোলকাতা
হয়ে এখন নাকি বালুরঘাটে আছ?
বোগেনরা কে কোথায় আছে জানো কি?
প্রণব প্রধান, রাধানাথ, শেখর উদয়, অতনু, সুনীল–এরা কোথায় কেমন আছে?
তোমাদের বোগেন সম্প্রদায়ের
হাফগুরু অশেষ দাশ নাকি ভিয়েতনামে
ওষুধের ব্যবসায় আছে।
মাঝে মধ্যে আসে কল্যাণীর বাড়িতে।
সেই অশেষ আমাদের দুদান্ত স্মার্ট কমানডার এনসিসিতে!
প্রবীর বসু, তারাশঙ্কর কৃষ্ণনগরের বাড়িতেই থাকে ।
রঞ্জন হাওড়ায় আছে।
আর আর হাফগুরুর মধ্যে কৃষ্ণ সান্যাল নেই।
হঠাৎই কাউকে কিছু না বলে কয়ে চলে গেছে
অপার কোন মায়ার দেশে।
ওখানে কাকে রবীন্দ্র সঙ্গীত
শোনায় কেষ্ট সান্যাল পাঞ্জাবি পাজামার বেশে?
হাফগুরু পরিতোষ তালুকদার, ব্যাটা কুঁড়ের বাদশা
দম দমে মাস্টারি শেষে সেই যে ঘাঁটি গেড়েছে,
সেখান থেকে নড়েনা।
কৃষ্ণনগরে আর তেমন আসেনা।
প্রদীপ ব্যানার্জী আর এক হাফগুরু বোগেনের,
কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ি যেতে নীলের মাঠের কাছের
ঠিকানায় ছিল। নিজের বাড়িতো ওর ওখানেই।
ও নেই এখন সেখানে। ঠিকানা পাল্টিয়ে চলে গেছে ঈশ্বরীর কাছে।
সরোজ সান্যাল অধ্যাপক ছিল কৃষ্ণনগর কলেজে কিছু দিন।
হঠাৎ সেদিন শুনলাম সরোজ-ও অকস্মাৎ চলে গেছে সেই অচিন মায়ার দেশে।
ওর ঐ দেশ ঈশ্বরী দর্শনের নয় - অন্য কোনোখানে, অন্য কোথাও!
আরও সব বোগেন বন্ধুরা স্ত্রীপুত্র কন্যা পরিবার নিয়ে
কোথায় কোথায় সংসার পেতেছে তাও জানা নেই।

জলঙ্গী ক্ষীণ স্রোতা তেমনি বয়,
শহর কৃষ্ণনগর অনেক পাল্টে গেছে–
ঠিক আগের মত নয়।
আমাদের প্রিয় কৃষ্ণনগর কলেজ,
সেই দেড়শ বছরের পুরোনো চট্‌কা গাছ,
নানান রঙের বোগেন ভেলিয়া ফুলের ঝোপঝাড়,
ঠিক তেমনটি আছে কি?
তাই থাকে নাকি এত বছর পর!
'এই কলেজ তুমি আমি চট্‌কা গাছ'।–
আমাদের বোগেনদেব অহৈতুকী পত্রিকায়
বোগেন সম্প্রদায়ের স্লোগান –আজও মনে পড়ে।
ঐ চট্‌কা গাছে অমর সম্পাদিত 'অহৈতুকী' বৃক্ষপত্রিকা
কেমন রঙে ঢঙে অভিনবত্বে প্রকাশিত হত বল।
অভিনব চট্‌কদার ছিল সেই কলেজীয় ছোকরাদের জীবন।
কবিতা- নাটক-খেলাধূলা-হুল্লোড়-প্রেমপ্রীতি-নবীনবরণ–
উৎসব থেকে কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচনে সরোজ অমরের তুখোড় পাল্টা পাল্টি বক্তৃতা!
সেই সব দিন কোথায় কেমন করে চলে গেল,
সময় বয়ে গেছে বছর পঁয়তাল্লিশ পার।
নানা রঙের বোগেন ভেলিয়া ফুলের গাছের নীচে ছিল
উচ্ছ্বসিত শ্যামলিমায় ভরপুর।
সেখানে আনন্দস্রোতে কেটে যেত দুরন্ত ছেলেদের দুপুর।
অমর, আমাদের স্বঘোষিত বোগেনগুরু
দিয়েছিল নাম: 'বোগেন সম্প্রদায়।'
গুচ্ছে গুচ্ছে রঙিন বোগেনভেলিয়া ফুল ফুটে থাকতো
কৃষ্ণনগর কলেজের সাজানো বাগানে।
তেমন যত্ন , সার, জল , এসব কিছুই লাগতোনা
বোগেনভেলিয়া তবু নানা রঙে–
লাল নীল হলুদ বেগুনি সাদায়।
ফুটে থাকতো হাসি হাসি
– রাশি রাশি।
বলেছিল অমর, এই রকম বোগেনভেলিয়া ফুলের মতই,
নানা রঙে, নানা রূপে উদ্দাম সবুজের দল আমরাও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একদিন বিকশিত হব নিজগুণে।
তাই এই ফুলের নামে আমাদের দলের নাম দিলাম 'বোগেন সম্প্রদায়।' 'হোসোন্না' জয় আমাদের হবেই।
'হোসেন্না' মানে তোমার জয় হোক। এক বোগেন অন্যজনের সাথে দেখা হলে বলত !
ফার্স্ট ইয়ারের তিন মেয়ে সুজাতা আরতি, আর রূপা ।
লাজুক রজনীগন্ধা যেন, ডাগর চোখে হাসি হাসি পুলকিত ত্রয়ী পড়ত

বোগেন গুরু অমর সম্পাদিত 'অহৈতুকী' বৃক্ষ পত্রিকা।
সারা কলেজের ছেলে মেয়ে ভেঙ্গে পড়ত 'অহৈতুকী, অহৈতুকী!'
সে এক কৌতুকী! জনপ্রিয়তার তুঙ্গে বোগেনদের স্লোগান:
এই কলেজ তুমি আমি চট্‌কা গাছ'।
বোগেনভেলিয়া গাছের ঝোপের পাশে গোল হয়ে
বসত বোগেন সম্প্রদায়ের আসর।
সেখানে গাঁজার কলকেতে সিগারেটের তামাক পুরে ধূমপান
সেই তামাকের ছিল অদ্ভুত মানেহীন নাম 'আলিগুন্ডি'।
সবুজ ঘাসে পাতা, রুমালে গুরুর নির্দেশে পড়ত
পাঁচ দশ কুড়ি পঁচিশ পঞ্চাশ পয়সা,
কখনো কখনো আস্ত একটাকা, দুটাকাও।
বীণাপাণি একমাত্র বোগেন সহপাঠিনী দিত আরও কিছু বেশি।
ঐ টাকায় ভোলাদার ক্যানটিন থেকে আসত চপ্, সিঙারা।
আহা, সে এক আনন্দভোজ!
ভাবছ যত সব বখাটে পড়াশোনা না করা ছেলেদের কান্ড!
মোটেই কিন্তু তা নয়।
কলেজের সব সেরা ছেলেরাই ছিল আমাদের বোগেনসম্প্রদায়ে
কেউ কিছুতে কম নয়।
পড়াশোনায়, নাটকে, গানে, গল্পে, কবিতায়, এনসিসিতে, খেলায়,
স্টাডি সার্কেলের প্রতিযোগিতায়, স্পোর্টসে, দুরন্ত তুখোড় একদল ছেলে।
বোগেন গুরুর নির্দেশ এলঃ নতুন কিছু করা। পোশাক সম্পর্কে উদাসীন থাক।
হে সবুজের দল, উল্টো পাল্টা কিছু কর। যা খুশি কর।
কলেজের দুই গেটে শুরু হল জুতো পালিশ, চানাচুর, চকোলেট
বাদামভাজা বিক্রি। বোগেন। বোগেন। বোগেন।
সারা কলেজ হৈ হুল্লোড়ে ক্যানটার করে দিল।
বোগেন সম্প্রদায় খুশির মেলায়।
কলেজ হস্টেলের সুপার ডক্টর শুকদেব সিংহকে ভূতের ভয় দেখানো...
ভূত তাড়াতে ফিজিক্সের হেড ব্রজনেবাবুর গীতা পাঠ...
ক্লাসে কিম্ভূত কিমাকার যাচ্ছেতাই পোশাক পরে আসার জন্য অধ্যাপকদের ভৎসনা ।
প্রিন্সিপালের নিকট নালিশ ।
অবশেষে অধ্যাপকদ্বয় রমেন্দ্রকু: আচার্য্য চৌধুরী ও সুধীর প্রসাদ চক্রবর্তীর মধ্যস্থতায়
শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি।
নাটক পাগল প্রিন্সিপাল চন্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় চারমিনারের ধোঁয় ছেড়ে
মিষ্টি মিষ্টি হাসতে হাসতে বলেছিলেন– অমর, অশেষ, কেষ্ট আর যেন এমনটা না হয়।
.. না স্যার, হ্যাঁ স্যার, বলে দ্রুত পলায়ন!

সেই সব আনন্দের দিন থার্ড ইয়ারের টেস্টের পরে শেষ।
কলেজ শেষ। তখন উনিশ আটষট্টির মার্চের পাতাঝরা বিষন্ন
দিন। আমাদের শিক্ষাবর্ষ শেষ।
হুহু বাতাসের সাথে মন ভারী করে বাড়ি ফেরা।
বুকের ভেতরে কান্না কাঃ ' বাজে বীণ।
বয়স বেড়েছে দামাল বোগেন ছেলেদের, বছর পঁয়তাল্লিশ
পার।
জলঙ্গী ক্ষীণস্রোতা আজও বয়।
শহর কৃষ্ণনগর আর আগের মত তেমন নয়।
ব্যস্ততার সমুদ্রে সময়ের সাথে দামাল বোগেন সম্প্রদায়ের
ছেলেরা হারিয়ে গেছে কে কোথায় ...।
তবু মনে মনে , মনের গহীনে আছে,
আছে সেই সব স্মৃতি কিছু আছে–
তোমার মনে
আমার মনে,
আমাদের মনে।

একান্ত আপন

প্রৈতি বিশ্বাস (১৯৯১–৯৫)

নয়ের দশক শুরুর মুখে
কয়েক বছর মনের সুখে
মাতৃক্রোড়ের স্নেহের ছায়ার কাটিয়ে ছিলাম দিন।
জীবনের এ সন্ধ্যাবেলায়
মন ভেসে যায় স্মৃতির ভেলায়
অতীত সুদূর উথ্‌লে ওঠে বাধা বন্ধহীন।
যৌবনেরই দুকূল ছেপে
ঘনঘটায় উঠত কেঁপে
রঙিন দিনের ফানুসগুলো উড়ত মেলে ডানা,
শিক্ষালাভের সোপান বেয়ে
পূর্ণতাতে পরাণ ছেয়ে
জীবনটাকে নূতনভাবে নিত্য হত জানা।
হাতছানি দেয় শেষের সেদিন,
তাও মনে হয় এই তো ক'দিন
আগেও ছিল হেথা মোদের অবাধ বিচরণ,
খোলামেলা প্রাঙ্গণে তার
উধাও হত মনের আঁধার
প্রাণের আবেগ জানান দিত 'সবই আপনজন।'
হৃদয় জুড়ে অসীম উদার
ভালো লাগার আবেশ দেদার
মনে করায় কোলটি মায়ের একান্ত আপন।

পুষ্টি

যখন আমি রুটি খাই, তখন
একটা রুটিকে আমি চাকার মতো গড়িয়ে দিই
আর দেখি, রুটির চাকাটি
নলডুরি বা সিন্দ্রানী গ্রাম
ইছামতী নদীটির পাশ দিয়ে পথ, মাঠ, খেত পেরিয়ে
গড়িয়ে চলে ।
রুটির চাকাটি গড়িয়ে চলে
ঐ রুটি যে দানা থেকে তৈরি সেই গমের খেত অবধি
সেই গম যে কৃষক ফলিয়েছে, তার বাড়ি অবধি
তারপর ঘর-গেরস্থালি, কুয়োতলা, ছেঁড়া কাঁথা অবধি
যখন ঐ রুটি গড়ায়, তখন
বহু প্রকার গ্রামীণ গল্প মনে পড়ে, বহু চিত্রকল্পের
আভাস পাওয়া যায় ।

একটি গ্রাম, তার লোকশিল্প, গান, রক্ত-নুন-শ্রম
ব্যথা বেদনার সুরে পুষ্ট এই রুটি থেকে
যখন এক টুকরো ছিঁড়ে মুখে পুরি, তখন মনে পড়ে
যারা গম ফলিয়েছে তাদের সন্তান সন্ততির
কেউ কি অভুক্ত থাকল ?

রুটির টুকরো ছিঁড়ে মুখে পুরে ভাবি
আমার শরীর অসংখ্য গমের দানা দিয়ে তৈরী একটা গমের শীষ।
প্রতিটি দানার মধ্যে বেজে ওঠে
এই উপ মহাদেশের লোকাচার, কিংবদন্তী, স্বপ্ন ও সঙ্গীত, আর
শীষের ডগায় ঝরে পড়ে ভারতীয় শিশির ও সূর্যোদয় ।

- দেবদাস আচার্য
প্রাক্তনী

ফিরে দেখা

রমা প্রসাদ পাল

প্রতিষ্ঠান বিরোধী। প্রতিবাদী চরিত্র। শোভনলাল মুখার্জী। অন্যতম নেতা কলেজ ইউনিয়নের। আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার। এর মাঝে রঞ্জনার প্রেমে ফিদা হল – শোভন। হয়তো বা নিজের অজান্তেই। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের ব্যবধান– বিস্তর। তবুও রাগে অনুরাগে–ওরা একে অন্যের পরিপূরক। অবিচ্ছেদ্য হয়ে রইল পুরো কলেজ জীবন।

মহাবিদ্যালয় থেকে – বিশ্ববিদ্যালয়। কর্মজীবন। প্রতিনিয়ত জীবন সংগ্রাম। এরই মাঝে হারিয়ে গেল – শোভন ও রঞ্জনা। বহুবছর পরে খুঁজে পেলাম সকালের কাগজে–'চা শ্রমিক আন্দোলনের নেতা শোভনলাল মুখার্জী হত। ডুয়ার্সের চা বাগানের মালিকের পেটুয়া গুণ্ডার গুলিতে"। সাতসকালে মনটা ভারাক্রান্ত হল। হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল রঞ্জনার মুখ। শুনেছিলাম ওর বাবা ছিলেন কোনো এক চা বাগানের মালিক। সেই সূত্রে রঞ্জনাদের শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের বাড়ীর কথাও।

কর্মসূত্রে আমাকে শিলিগুড়ি যেতে হয়। মাঝে মাঝে। সুযোগ এল – মাসখানেকের মধ্যে। শোভনের মৃত্যু মানতে পারছিলাম না। ভাবলাম এবার যাব। রঞ্জনাদের শিলিগুড়ির বাড়ীতে। কোনো কিছু না জানার ভান করে। কেয়ারটেকারের কাছে রঞ্জনাদের বাড়ীর খবর জানতে। মূল উদ্দেশ্য রঞ্জনা। কৃষ্ণনগর কলেজ ছাড়ার পর– আর দেখা হয়নি। খবরও পাইনি। জীবনের ব্যস্ততায়। অফিসের কাজে সকালে শিলিগুড়ি পৌঁছে– নির্ধারিত হোটেলে উঠে তাড়াতাড়ি তৈরী হলাম। ডোর বেল বাজল। ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে হাজির–জানান দিল। আমার গন্তব্য দার্জিলিং। অজ্ঞাত তাগিদে ফিরে এলাম শিলিগুড়ি বিকেল পাঁচটায়। হাতে অনাবশ্যক সময়। ড্রাইভারকে জানতে চাইলাম– হিলকার্ট রোডের "দত্ত প্যালেস" চেনে কিনা ? ড্রাইভার মাথা নাড়ল। বললাম চল। বিরাট সিংহ দুয়ার। বেল বাজাতেই চিৎকার জুড়ে দিল – বিদেশী সারমেয়র দল। দারোয়ান গেট খুলল। বললাম নিজের নাম। বাড়ী কৃষ্ণনগর। এখন কোলকাতা থেকে আসছি। দত্ত সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। দারোয়ান ইন্টারকমে জানাল আমার আগমন বার্তা। পূর্ণ পরিচয়সহ। কি কথা হল জানি না। 'ম্যাডাম আছেন' – বলে দারোয়ান আমাকে নিয়ে গেল বাড়ীর ভিতরে। সসম্মানে বসাল অতিকায় বসার ঘরে। রুচি ও প্রাচুর্য্যের পরিপূর্ণতায় ঝলমল করছে চারদিক। দরজার ভারী পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল রঞ্জনা। আমি চমকে গেলাম। 'তুমি এখানে! কি ব্যাপার!' শান্ত স্নিগ্ধ ওর বলার ধরন। অকারণ উচ্ছলতা নেই কলেজ জীবনের। এমনি এলাম। কর্মসূত্রে শিলিগুড়ি এসেছি। ভাবলাম দেখি কলেজের দেওয়া ঠিকানায় তোমার সন্ধান পাই কিনা। কেমন আছ? "ভাল" – সংক্ষিপ্ত উত্তর। রঞ্জনা আগের মত ছিপছিপে নেই– আবার মোটাও নয়। সবমিলিয়ে সাদা শিফনের শাড়ীতে বেশ লাগছে। তবু শূন্যতা ওর কপাল জুড়ে। বড় টিপের অনুপস্থিতি। তাই ও কিছুটা ম্লান। অনেক কথা হল। বারবার ঘুরে ফিরে এল–আমাদের কলেজের প্রসঙ্গ। উহ্য শুধু শোভন। চা পর্ব মিটল। রাতের খাওয়ার নিমন্ত্রণ–আমার পক্ষে রাখা সম্ভব হল না। বললাম অন্য কোন দিন হবে। উঠতে উঠতে হঠাৎ বলে বসলাম – শোভন..? 'না ও আজ আর নেই" স্বগতোক্তির মতো শোনাল। 'আমাদের সম্পর্ক বাবার আভিজাত্যে ঘা দিল। আমি নির্বাসিত হলাম কৃষ্ণনগর থেকে শিলিগুড়ি– চা বাগানের দায়িত্বে। শোভন চলে গেছে। আমি বসে আছি ওর ডাকের অপেক্ষায়।" আমি বাকরুদ্ধ। কোনো এক অদৃশ্য শক্তি আমায় ঠেলে দিল দরজার দিকে। ... বেরিয়ে পড়লাম দ্রুত পায়ে– মিশে গেলাম অন্ধকারের গভীরে।

পুষ্টি

যখন আমি রুটি খাই, তখন
একটা রুটিকে আমি চাকার মতো গড়িয়ে দিই
আর দেখি, রুটির চাকাটি
নলডুরি বা সিন্দ্রানী গ্রাম
ইছামতী নদীটির পাশ দিয়ে পথ, মাঠ, খেত পেরিয়ে
গড়িয়ে চলে ।
রুটির চাকাটি গড়িয়ে চলে
ঐ রুটি যে দানা থেকে তৈরি সেই গমের খেত অবধি
সেই গম যে কৃষক ফলিয়েছে, তার বাড়ি অবধি
তারপর ঘর-গেরস্থালি, কুয়োতলা, ছেঁড়া কাঁথা অবধি
যখন ঐ রুটি গড়ায়, তখন
বহু প্রকার গ্রামীণ গল্প মনে পড়ে, বহু চিত্রকল্পের
আভাস পাওয়া যায় ।

একটি গ্রাম, তার লোকশিল্প, গান, রক্ত-নুন-শ্রম
ব্যথা বেদনার সুরে পুষ্ট এই রুটি থেকে
যখন এক টুকরো ছিঁড়ে মুখে পুরি, তখন মনে পড়ে
যারা গম ফলিয়েছে তাদের সন্তান সন্ততির
কেউ কি অভুক্ত থাকল ?

রুটির টুকরো ছিঁড়ে মুখে পুরে ভাবি
আমার শরীর অসংখ্য গমের দানা দিয়ে তৈরী একটা গমের শীষ।
প্রতিটি দানার মধ্যে বেজে ওঠে
এই উপ মহাদেশের লোকাচার, কিংবদন্তী, স্বপ্ন ও সঙ্গীত, আর
শীষের ডগায় ঝরে পড়ে ভারতীয় শিশির ও সূর্যোদয় ।

- দেবদাস আচার্য
প্রাক্তনী

পুষ্টি

যখন আমি রুটি খাই, তখন
একটা রুটিকে আমি চাকার মতো গড়িয়ে দিই
আর দেখি, রুটির চাকাটি
নলডুরি বা সিন্দ্রানী গ্রাম
ইছামতী নদীটির পাশ দিয়ে পথ, মাঠ, খেত পেরিয়ে
গড়িয়ে চলে ।
রুটির চাকাটি গড়িয়ে চলে
ঐ রুটি যে দানা থেকে তৈরি সেই গমের খেত অবধি
সেই গম যে কৃষক ফলিয়েছে, তার বাড়ি অবধি
তারপর ঘর-গেরস্থালি, কুয়োতলা, ছেঁড়া কাঁথা অবধি
যখন ঐ রুটি গড়ায়, তখন
বহু প্রকার গ্রামীণ গল্প মনে পড়ে, বহু চিত্রকল্পের
আভাস পাওয়া যায় ।

একটি গ্রাম, তার লোকশিল্প, গান, রক্ত-নুন-শ্রম
ব্যথা বেদনার সুরে পুষ্ট এই রুটি থেকে
যখন এক টুকরো ছিঁড়ে মুখে পুরি, তখন মনে পড়ে
যারা গম ফলিয়েছে তাদের সন্তান সন্ততির
কেউ কি অভুক্ত থাকল ?

রুটির টুকরো ছিঁড়ে মুখে পুরে ভাবি
আমার শরীর অসংখ্য গমের দানা দিয়ে তৈরী একটা গমের শীষ।
প্রতিটি দানার মধ্যে বেজে ওঠে
এই উপ মহাদেশের লোকাচার, কিংবদন্তী, স্বপ্ন ও সঙ্গীত, আর
শীষের ডগায় ঝরে পড়ে ভারতীয় শিশির ও সূর্যোদয় ।

- দেবদাস আচার্য
প্রাক্তনী

আয়নাতে মুখ দেখবো না

দীপঙ্কর দাস

তোমার সামনে দাঁড়াই যতবার
ফুটে ওঠে আমার প্রতিচ্ছবি
আয়না, তোমার অদ্ভুত ব্যবহার-
দক্ষিণ আমার, তোমার বামে সবই।
সকাল দুপুর রাত্রি বারো মাস
আমার হাসি আমায় ফিরিয়ে দাও,
আমার কান্না, আমার আবেগ, ত্রাস–
তোমার মাঝেই আমার করে নাও।
খুলে আমার মনের দরজা তুমি
নামিয়ে যে দাও আমায় অতল তলে–
অতীত থেকে বর্তমানে আমি
দুঃখ দেখি সুখ খুঁজবার ছলে।
সেই শৈশব, কৈশোর, যৌবনে
অরুণ আলোর গোধূলি ছোঁয়ার ছল,
স্কুল পেরিয়ে কলেজ অলিন্দে
নতুন প্রেমের নীরব কোলাহল।
আয়না তোমার সোহাগ চোরাবালি
আমার অতীত ডুবছে আমায় নিয়ে,
আয়না, আমার চোখের কোণে কালি,
অতীত ভুলের সব ভুলতে গিয়ে।
তাইতো তোমায় প্রশ্ন করি নিজে
এই কি আমার সত্যি আসল মুখ?
নাকি হিংসাই ভালোবাসা সেজে,
ঠকিয়ে, দেয় স্বার্থপরের সুখ।
আয়নাতে আর এ মুখ দেখবো না–
সেখানে শুধুই সেই অভিনেতা জাগে,
হেসে হেসে যে মুখোশ পরে নানা,
সাদা পাতা ভরায় কালির দাগে।

কবিতা আর লেখা হল না

কিশোর বিশ্বাস

ইচ্ছে করে দিব্যেন্দু পালিত নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
মল্লিকা সেনগুপ্তের মতো কবিতা লিখি
রোজ খাতা খুলি আর বন্ধ করি
একটাও কালির আঁচড় খাতার পাতায় পড়ে না।
কঠিন কঠিন ভাষা বুকের কাছে আসে
অক্ষরগুলো হাতের আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করি
তবুও খাতার পাতায় কালির আঁচড় পড়ে না
লিখতে গিয়ে কলমের কালি রক্তের মতো
জমাটবদ্ধ হয়ে যায়।
এ মনে বাসা বেঁধেছে ভাষা
ভাষাগুলো মনের দরজায় গুঁতো খেয়ে
প্রতিধ্বনির মতো ঘুরছে
মাথার মধ্যে অজস্র ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ
ভাঙা ঘর ফুটো চাল শূন্য হীন পাত্র
বর্ষণে ঘর ভেসে যায়
মনে ভাঙন লেগে যায়
বাইরে থেকে কীর্তনের সুর ভেসে আসে
'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার করো গো আমায়'
ভাবনার নেশায় বুঁদ হয়ে যায় মন
মদ খেলে নাকি দারুণ সব কবিতার
লাইন বেরোয়
মদ খেলাম কিন্তু কবিতার লাইন বেরোল না।
মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকালে কবিতার
লাইন বেরোয়
মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকালাম কবিতার
লাইন বেরোল না।
রক্তাক্ত মন রোদের গুঁড়োয় মিশতে চায়
ভাবতে ভাবতে চুলে পাক ধরে
শরীরে সমস্ত চামড়া গুটিয়ে যায়
বাতাস এসে পিঠ চাপড়িয়ে বলে চলো
প্রাণ চলে যায়
কবিতা লেখা আর হল না।

স্মৃতির টুকরো কোলাজ

মার্জনা ঘোষ গুহ

যদিও ঠিক যে আমার অনেক কিছুই লিখবার আছে ইচ্ছা, কিন্তু ঠিক যে কিভাবে লিখব ভেবে চিন্তে ঠিক করতে পারিনি এখনো কলম তো ধরেছি, দেখিই না কেন, সে কোথায় নিয়ে যায়।

আমি কলেজে কাটিয়েছি ক্রান্তিকাল বলতে যে সময়টা বোঝায় ঠিক সে সময়টা। ৬০এর দশকের শেষ ৭০এর অগ্নিঝরা অগ্নিগর্ভা নক্ষত্র মেধার দুর্বার রক্ত ঝরা পতনের এক অমানিশার ঘোর অন্ধকার রাত্রি! এক দশকের বেশী সময় ধরেই যে রাত্রের বিচারের বাণী সঘোষে বুলেট বর্ষণ করেছে। এই পথ ঠিক না বেঠিক তার বিচারের ভার রইল মহাকালের হাতে– কিন্তু সেই সময়ের কুশীলব হয়ে আমাদের সময়টা পার হতে গিয়ে এই সময়ের সাক্ষী হয়ে গেছি। ঠিক এই জন্যই আমার এই স্মৃতির সরণি বেয়ে চলা না হলে গড়পড়তা আর পাঁচজনের মতই আমাদের কলেজ জীবন হতে পারত!

আরও একটা প্রাসঙ্গিক কথা আমার মনে হয়েছে। তা হল আমাদের যে কলেজ যাপন ছিল এখনকার ছাত্রছাত্রীদের কাছে তা একটু তির্যক হাসির উপকরণ হবে হয়তো বা।

আমরা ছিলাম বলতে গেলে অবগুণ্ঠণবতী না হলেও অন্তরালবর্তিনী। ষ্টাফরুমের পাশেই আমাদের সুবিশাল কমনরুমের সুরক্ষিত গুহাবাস ছিল। কোনো ছাত্রের সেদিকে দৃকপাতের অধিকারও প্রায় ছিল না বলতে গেলে। কলেজের যত্রতত্র বিচরণ করার কোনো ছাড়পত্র আমাদের মেয়েদের ছিল না। স্যাররা ক্লাসে যখন যেতেন সজাগ দৃষ্টি রেখে তাঁদের অনুসরণ করেই আমরা মেয়েরা দল বেঁধে ক্লাসে যেতাম। ক্লাস শেষে শ্রেণী বেঁধে আবার স্যারের পিছনেই এসে কমনরুমের ঘেরাটোপে নিরাপদ আশ্রয় নিতাম । (এবং অবশ্যই শাড়ি পরিহিতা)।

বলাবাহুল্য ৮০ ২০ অনুপাত ছিল ছেলে ও মেয়েদের। উইমেন্স কলেজে কেবল অর্থনীতি ও বাংলায় ছাড়া বাকি শাখায় কেবল মাত্র সাম্মানিক ছাত্রীরাই কৃষ্ণনগর কলেজে (তখন গভ: কলেজ বলা হত না) পড়তে পেত। এই ছাড়পত্র অনুসারে আমরা যথার্থই লঘিষ্ঠ সংখ্যক ছিলাম।

এখানে স্বত:ই একটি উল্লেখ্য হচ্ছে এই গুহায়িত বাসেই কিছু কিছু ভালো লাগা মুকুলিত হয়েছিল, তবে বেশীর ভাগ মুকুলই কুসুমিত হয়নি। তবে জয়া–স্বপন, ছন্দা–দেবাশিষের স্বপ্নই বাস্তব হয়েছিল। অবশ্য জয়া ছন্দা দুজনেই সংস্কৃত বিভাগের ছাত্রী। দুঃখের সাথে এও স্মরণ করছি যে ছন্দা দেবাশিষকে একা করে অমর্তলোকে আশ্রয় নিয়েছেন ৫/৬ বছর হল।

আমাদের ৬৭'র ব্যাচ লাল অক্ষরে নিজেদের স্মরণীয় করেছেন। সেই প্রথম ছাত্র ফেডারেশন (S.F) সি.পি. আই. এম.এল. কলেজ নির্বাচনে অংশ নিয়ে কলেজ ইউনিয়ন দখল করেছিল বিরোধী প্রার্থী বি.পি.এস এফ. (বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন– মার্কসবাদী) এবং সি.পি. (ছাত্র পরিষদ কংগ্রেস) প্রার্থী উভয়কেই পরাজিত করে। সাধারণ সম্পাদক জি. এস. । নক্সাল পন্থী থেকেই নির্বাচিত হয়েছিল। আর আমরা নিজেদের সেই সময়ের কান্ডারী অর্থাৎ আমরা নতুনরা সবাই (না বুঝেই) 'পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে কালের যাত্রায়' গোছের মানসিকতা নিয়েই এগিয়েছিলাম। একটা কথা বলি সেসময় আমাদের প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত শিবদাস মুখার্জীও (৩য় বর্ষ) ছাত্র পরিষদের প্রার্থী হয়েছিলেন। তাঁকে আমরা নির্বাচনে পরাজিত করেছিলাম।

আসলে নীলবিদ্রোহ থেকে যে প্রগতির হাওয়া কৃষ্ণনগর তথা নদীয়াকে আলোড়িত করেছিল তারই তরঙ্গ নারীশিক্ষায় প্রতিফলিত। বেথুন স্কুলের প্রথম ছাত্রীদ্বয় ছিলেন নদীয়ার গর্ব মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুই

আয়নাতে মুখ দেখবো না

দীপঙ্কর দাস

তোমার সামনে দাঁড়াই যতবার
ফুটে ওঠে আমার প্রতিচ্ছবি
আয়না, তোমার অদ্ভুত ব্যবহার-
দক্ষিণ আমার, তোমার বামে সবই।
সকাল দুপুর রাত্রি বারো মাস
আমার হাসি আমায় ফিরিয়ে দাও,
আমার কান্না, আমার আবেগ, ত্রাস–
তোমার মাঝেই আমার করে নাও।
খুলে আমার মনের দরজা তুমি
নামিয়ে যে দাও আমায় অতল তলে–
অতীত থেকে বর্তমানে আমি
দুঃখ দেখি সুখ খুঁজবার ছলে।
সেই শৈশব, কৈশোর, যৌবনে
অরুণ আলোর গোধূলি ছোঁয়ার ছল,
স্কুল পেরিয়ে কলেজ অলিন্দে
নতুন প্রেমের নীরব কোলাহল।
আয়না তোমার সোহাগ চোরাবালি
আমার অতীত ডুবছে আমায় নিয়ে,
আয়না, আমার চোখের কোণে কালি,
অতীত ভুলের সব ভুলতে গিয়ে।
তাইতো তোমায় প্রশ্ন করি নিজে
এই কি আমার সত্যি আসল মুখ?
নাকি হিংসাই ভালোবাসা সেজে,
ঠকিয়ে, দেয় স্বার্থপরের সুখ।
আয়নাতে আর এ মুখ দেখবো না–
সেখানে শুধুই সেই অভিনেতা জাগে,
হেসে হেসে যে মুখোশ পরে নানা,
সাদা পাতা ভরায় কালির দাগে।

কবিতা আর লেখা হল না

কিশোর বিশ্বাস

ইচ্ছে করে দিব্যেন্দু পালিত নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
মল্লিকা সেনগুপ্তের মতো কবিতা লিখি
রোজ খাতা খুলি আর বন্ধ করি
একটাও কালির আঁচড় খাতার পাতায় পড়ে না।
কঠিন কঠিন ভাষা বুকের কাছে আসে
অক্ষরগুলো হাতের আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করি
তবুও খাতার পাতায় কালির আঁচড় পড়ে না
লিখতে গিয়ে কলমের কালি রক্তের মতো
জমাটবদ্ধ হয়ে যায়।
এ মনে বাসা বেঁধেছে ভাষা
ভাষাগুলো মনের দরজায় গুঁতো খেয়ে
প্রতিধ্বনির মতো ঘুরছে
মাথার মধ্যে অজস্র ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ
ভাঙা ঘর ফুটো চাল শূন্য হীন পাত্র
বর্ষণে ঘর ভেসে যায়
মনে ভাঙন লেগে যায়
বাইরে থেকে কীর্তনের সুর ভেসে আসে
'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার করো গো আমায়'
ভাবনার নেশায় বুঁদ হয়ে যায় মন
মদ খেলে নাকি দারুণ সব কবিতার
লাইন বেরোয়
মদ খেলাম কিন্তু কবিতার লাইন বেরোল না।
মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকালে কবিতার
লাইন বেরোয়
মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকালাম কবিতার
লাইন বেরোল না।
রক্তাক্ত মন রোদের গুঁড়োয় মিশতে চায়
ভাবতে ভাবতে চুলে পাক ধরে
শরীরে সমস্ত চামড়া গুটিয়ে যায়
বাতাস এসে পিঠ চাপড়িয়ে বলে চলো
প্রাণ চলে যায়
কবিতা লেখা আর হল না।

কন্যা। এই বিপ্লব তাই আমাদের কিশোর মনে সেই তরঙ্গের অভিঘাত এনেছিল।

আমাদের সাথে ছেলেদের প্রায় অহিনকুল সম্পর্কই সে সময় ছিল। কলেজের অধ্যক্ষের কোয়াটার্সের সীমানা প্রাচীর আমাদের নানা নামালঙ্কারে ভূষিত করা হত। ব্রাকেটে সঠিক নামটাও থাকত—নামের মধ্যে লগা সুন্দরী, ক্লিও পেট্রা, শিখন্ডী, মতি বিবি, মার্জার সুজি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য থেকে পশু মানবী কেউই বাদ পড়ত না। এছাড়া নানারকম জৈবিক ধ্বনি বিকারের মধ্যেও তারা বিনোদন খুঁজে পেত। আমাদের নিয়ে যখনই কলেজ থেকে প্রবেশ প্রস্থান হত তখনই নাদব্রহ্মের বিভিন্ন স্রোতে আমরা সিক্ত হতাম। বলা বাহুল্য কেউই ফিরে তাকিয়ে প্রতিবাদের কথা ভাবতাম না নানা আজানা কারণে! একমাত্র ব্যতিক্রমী অলক্তিকা পালধি। ওকে ফর্সা নাদুস নুদুস গঠনের জন্য অষ্ট্রেলিয়ান হাতি—আমার রোগাটে গড়ন এবং ওর আমার অভিন্ন জুটি থাকায় মার্জার, লরেল হার্ডি ইত্যাদি বিভূষণে ভূষিত করত। অলক্তিকা মাঝে মাঝেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা চোখে বীরপুঙ্গব সহপাঠীদের দিকে দৃষ্টিপাত করত। দৃষ্টিপাত মাত্রই বীরের দল পাতলা হয়ে যেত। ও ছিল যেন কলেজে আমার রক্ষাকবচ! গ্যালারীতে ক্লাস হলে প্রমাদ গুণতাম। একে রক্ষণশীল পরিবার থেকে আগতা তাতে স্বভাবভীরু। ওপরের গ্যালারী থেকে নানা কাগজের (মন্তব্য) দলাপাকানো ঢিল মাঝে মাঝেই মাথায় গায়ে এসে পড়ত! একবার এমন একটি কাগজ বোমা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে স্যারের টেবিলে (অধ্যাপক মিহিরবিকাশ ভট্টাচার্য্য) পড়ে এবং যথারীতি স্যারের হস্তগত হয়। আমার তো ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া অবস্থা। স্যার ক্লাসের শেষে আমাকে ষ্টাফরুমেই ডাকলেন। আমি তো ভাবলাম কলেজের পাট চুকল—এসব খবর জানা জানি হবেই আর আমার সাহোদরা এই কলেজেরই ছাত্রী; কিন্তু বিপরীত চরিত্র। উনি আমার করুণ অবস্থা দেখে পরিত্রাতার মত অভয় দিয়ে বললেন 'এসব একদম গায়ে না মেখে নিজের মতোই থাকতে।'

আমরা স্যারদের স্নেহধন্যা কেননা কমন সাবজেক্টএর স্যাররা আমাদের সবার নাম জানতেন আর এখনও মনে রেখেছেন। তবে সহপাঠীদের কাউকেই ছোট করছি না—সাম্মানিক বিভাগের ছাত্ররা কিন্তু আমাদের সঙ্গে শিষ্টতা বজায় রেখেই চলত—কিন্তু পাসের ছেলেদের আচরণ আমাদের স্বস্তিতে বিচরণ করার পক্ষে বাধা ছিল! আমার মনে হয় সে সময় প্রত্যেকের বাড়িতে বাবা মায়ের ভয় ও অনুশাসন কড়া ছিল। তাই হঠাৎ করে কলেজের খোলা হাওয়ায় সেই প্রথম বিপরীত মেরুর প্রাণীদের মুখোমুখি হবার আনন্দ-উত্তেজনায় 'হয়ত' তারা এসব দুষ্টুমি করত। এই সহপাঠীরা বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনের নানা ক্ষেত্রে! তখন এটা "" ছিল "Play to them but death to us." এদের মধ্যে দুষ্টুশিরোমণি মতি ঘোষ এতটাই পরিবেশগুণে পরিশীলিত হয়েছে যে সে শ্রী অরবিন্দ আশ্রমে আশ্রমিক হয়ে ঈর্ষণীয় জীবনযাপন করছে। তাকে দেখেও আমিই এখন পবিত্র ঈর্ষা অনুভব করি।

এমনকি এখন দেখা হলে ছেলেরা আপনি— আজ্ঞে করেই কথা বলে —উল্টে আমরা মেয়েরা তাদের নাম ধরেই কথা বলি।

শুধু দুষ্টুমি নয় এদের হৃদয়বত্তার পরিচয়ও আমরা পেয়েছিলাম একবার। আমাদের কলেজ সোশ্যাল নিয়মিত তখন প্রতি বছর রবীন্দ্রভবনেই হত । ৬৮ তে এক সুন্দর সকালে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। উদ্বোধন সংগীতের পর আমাদের ৩য় বর্ষের সংস্কৃতের ছাত্রী জয়শ্রী ভট্টাচার্য্য "আমার মল্লিকাবনে যখন প্রথম ধরেছে কলি"— শুরু করার সাথে সাথে যেন অশোক বন থেকে নিকষা নন্দনরা (S.F.এর ছেলেরা) ভয়ানক খন্ডযুদ্ধে লিপ্ত হল অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য। গোলমালের সময় বার হতে গিয়ে আমি চেয়ারের নীচে পদপিষ্ট হবার উপক্রম। আমার এক সহপাঠী নিজের মাথার উপর চেয়ার বৃষ্টি উপেক্ষা করে আমাকে নীচ থেকে উদ্ধার করেছিল।

আমার আর এক সহাপাঠিনী (ইংরাজী বিভাগ) ভীড় ঠেলে বার হতে গিয়ে শাড়ি পুরো খুলে গেছিল অন্য দরদী বন্ধু আবার সেই শাড়ি এনে দেয়–উদ্ধার করে।

আজ লিখতে বসে তাদের নাম উল্লেখ করলাম না। সে সময়ের সেদিন আমাদের কাছে লজ্জার ছিল। কলেজের সোস্যাল রাজনৈতিক গন্ডগোলে পন্ড হল বলে!

(এখনকার মতো সর্বদা সব কলেজে তখন গন্ডগোলের বাতাবরণ ছিল না একেবারেই) বাংলার বুকে শিক্ষাক্ষেত্রে পেশী শক্তির এই প্রবেশও বলতে গেলে এই কলেজের হাত ধরেই। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য আন্দোলনে (১৯৬৬) প্রথম ছাত্রশক্তি জড়িত হয়ে পড়েছে এই কৃষ্ণনগরের বুকে। তখনই এক নৈরাজ্যের বাতাবরণ অন্ত:সলিলা হয়ে অনধিকার প্রবেশ করেছে। ৺ অলক্তিকা পালধি (দর্শন) (১৩ই মে ২০০৯) ৺মিতা পাল চৌধুরী (দর্শন)(১৩ ই আগষ্ট ১৯৮৯) ৺দীপ্তি রায় (ইংরাজী) (১৮ই নভেম্বর ১৯৮৬) ৺ পূর্ণা কাঞ্জিলাল (ইতিহাস) (৩০শে মার্চ ১৯৯৬) আমার এই স্মৃতিচারণ অলক্ষ্যে অলকাপুরীর বাসিন্দা হয়েই অনুভব করছে হয়তো। সাথে এই পাতায় চোখ রাখবে যারা তারা কেউ হয়তো ভাববে বাতুলতা, কেউ বলবে- ছেলেমানুষী নিতান্তই।

তবুও সেই ষোড়শীর রঙিন চোখ কমনরুমের সুপ্রশস্ত মমতাময় বারান্দা থেকে দেখা ঋজু শিমুল দেবদারু পলাশ বৃক্ষের সারি, রাজকীয় ঔদার্যে বিশাল ক্লাসিক স্বপ্নময় ধ্যানগম্ভীর মহাবিদ্যালয়ের প্রাসাদোপম অট্টালিকা, প্রবেশ পথের (রাজপথ থেকেই) দুই সারির অশ্বত্থ, পিয়াল, পলাশ শাল দেবদারু, শিমুল, মহুয়ার প্রশান্ত উদাত্ত মায়াময় ছায়াপথ (মানুষের নিকৃষ্ট লোভের বলি হয়েছে বর্তমানে সেখানে বাণিজ্যিক নির্মাণে ভরে গেছে) যে আবেশ রচনা করেছিল এই বিগত যৌবনা সেই কিশোরী ষোড়শীর চোখই তাকেই যে খুঁজে ফেরে বারবার!

অলমিতি বিস্তরেণ
মধুরেণ সমাপয়েৎ।।

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."
— Nelson Mandela

"Intelligence plus character-that is the goal of true education."
— Martin Luther King Jr.

ইচ্ছে করে

মিতা দে

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার দোলাচলে– মন হয় উথাল–পাথার।
স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসি বারে বার,
এক অদম্য কৌতূহল নিয়ে থাকি গভীর প্রত্যাশায়।
দেখি তো? পাই নাকি কোন দুর্লভ মণি–মুক্তোর সন্ধান।
সযতনে রাখা আমার মনে মণিকোঠায় রাখা এই গোপন কুঠুরি,
যেখানে স্মৃতির সরণি বেয়ে এক রাশ সুখের ঝলকা হাওয়া,
বয়ে আনে কলেজ জীবনের টুকরো টুকরো কতগুলি,
নির্নিমেষ মুহূর্তের কোলাজ।
আসে ভিড় করে মনের দুয়ারে একে একে,
গথিক আর্টের অপূর্ব স্থাপত্য শৈলী,
সবুজের মায়াভরা বিশাল মাঠের লোভনীয় হাতছানি,
কলকাকলিতে ভরা নান্দনিক বনবিতান,
করিডর ভরা উচ্ছল কলকলানি,
ত্রস্তপদে হেঁটে যাওয়া শ্রদ্ধেয় শিক্ষাব্রতীগণ,
অফিসের দাদার যারা চিরকালই ছিল বড়ই আপনজন।
আমাদের সুখে–দুঃখে, বিপদে–শোকে, পাশে পেয়েছি যাদের সদা সর্বদা।
মনে পড়ে যায়, কত ছোট ছোট ব্যথা,
হাসি কান্না আর বিচ্ছেদের দিনগুলির সঘন আবাহন।
অতীত যেন শুধু ফিরে ফিরে হয় বাঙ্ময়।
জীবিত মৃত, যারা ছিল বা নেই সকলেরই
যেন আজ অদৃশ্য অপ্রতিহত উপস্থিতি,
আসে যায় আমার কাছে অবিরত।
ইচ্ছে করে আমার
এ কিশলয় জীবন পথের পথিক হয়ে ওই,
ঐতিহ্যময়ী পাদপ্রদীপের তলে এসে দাঁড়াতে
দুই বাহু মেলে শুধু একবার, মুঠো মুঠো অঞ্জলি,
ভরে দিই আমার এই কলেজ –মার পদতলে,
যা হয়ে থাকবে অক্ষয়, অমর আর চিরন্তনের,
মূর্ত আর দীপ্ত প্রতীক।

|| এখানেই ব্যথা ||

তুমি আমি সে – সবার সঙ্গেই থাকি
তবু যেন কারুর সঙ্গেই থাকি না –
এই বোধ, এখানেই ব্যথা ।

মানুষের স্বভাব নয় একা থাকা,
আমিও থাকি না একা, তবু –
কেন একা মনে হয় ।
এই বোধ, এখানেই ব্যথা ।

মানুষের স্বভাব – জল, জঙ্গল,
আকাশ, পশু-পাখি, মানুষ –
সব নিয়ে, সুন্দর হয়ে থাকা
পূর্ণ হয়ে থাকা ।

থাকতে তো চাই তেমনই –
মনে হয় – থাকিও তো তাই, তবু –
কেন একা মনে হয় !

কাকে যেন খুঁজে ফিরি সব সময়
তাই, তুমি আমি সে – সবার সঙ্গেই থাকি,
তবু যেন কারুর সঙ্গেই থাকি না –
এই বোধ, এখানেই ব্যথা ।

এখানে খুঁজি যেন তাকে
যে তোমার, তার, তবুও কেবলই আমার;
তাই কেবলই একা মনে হয় –
এই বোধ, এখানেই ব্যথা ।

- ডঃ বাসুদেব সাহা

The 10 Commandments of the Christian world

1. You shall have no other gods before Me.
2. You shall not make idols.
3. You shall not take the name of the LORD your God in vain.
4. Remember the Sabbath day, to keep it holy.
5. Honor your father and your mother.
6. You shall not murder.
7. You shall not commit adultery.
8. You shall not steal.
9. You shall not bear false witness against your neighbor.
10. You shall not covet.

পেলাম তোমাকে

রুণু ভট্টাচার্য্য

বোলপুরে গেলাম / তোমাকে পেলাম না,
তাই খুঁজতে খুঁজতে চলে গেলাম,
সেই ভুবন ভাঙার মাঠে
যেখানে তালগাছটা একপায়ে দাঁড়িয়ে,
সেখানেও তো তুমি নেই!
তবে কি খোয়াইএ আছো?
যেখানে ঝির ঝির করে চলেছে জল
ছোট্ট ছোট্ট টিলার তলায় তলায়
কোথাও গর্ত কোথাও নুড়ি,
টুপটুপ মহুয়া ঝরছে / ভেসে ভেসে চলেছে
না: সেখানেও তো তুমি নেই!
আবারও খুঁজতে চললাম্ / দূরে সোনাঝুরির বনে
হলুদ সবুজ পাতায় ফুলে/বোধহয় আছন্ন
ক্লান্ত বিপর্যস্ত – কোথাও নেই তুমি।
ফিরে এলাম ঘরে / দেখি একগুচ্ছ স্বর্ণচাঁপা,
বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাস / হাতে নিয়ে দেখি একি!!
এ যে রবীন্দ্রনাথ।

Fundamentals of all Religions

The Panchshila of Buddha

All the religions of the world are based on the fundamental principles of good conduct and prohibit their followers to indulge in the misconduct and misbehavior that may harm the society at large. So, the Panchshila of Buddha is comprised of the basic teachings of conduct which are as under:

1. No killing	Respect for life
2. No stealing	Respect for others' property
3. No sexual misconduct	Respect for our pure nature
4. No lying	Respect for honesty
5. No intoxicants	Respect for a clear mind

জীবন যে রকম

মানসী দে

শীতের হিমের পরশে ঘুমঘোর সুখ–স্বপ্নের,
আবেশে মুদিত আঁখিপল্লবে,
কে যেন দিল সশব্দ নাড়া।
ওঠো ওঠো চোখ খুলে দেখ।'
মিষ্টিমধুর আর মমতাভরা উদাত্ত স্বরে,
কে যেন ডাকছে বারে বারে তার স্নেহ মাখা মুখখানিতে!
উত্তাল হাওয়ার বেগে আলো ঝলমল দিনে,
উঠে পড়ি ধড়মড় করে।
বারে বারে শুধাই আমার মনকে,
কে যেন ডাকে আমায় এমন পাগলপারা করে।
কত আগ্রহ আর উদ্দীপনায় ভরপুর মন প্রাণ জুড়ে,
রয়েছে বছরের একটাই দিন,
তা হল আমাদের কলেজের পুনর্মিলন।
এধার–ওধার থেকে জড়ো হই আমরা সবাই,
যতজন আছি যেখানে, স্থানীয়, বিদেশী আর প্রবাসী,
প্রাক্তনী ভাইবোনেরা মিলে গড়ে তুলি এক মহা সম্মেলন।
হাসি আর আনন্দের ঝরনাতলায় বয়ে চলে–
স্বতঃস্ফূর্ত স্রোতধারা আর শান্ত ঢেউয়ের চকিত আলোড়ন।
মাঝে মাঝে সাদর, আন্তরিক সম্ভাষণ আর দরদভরা আত্মীয়তার
মেলবন্ধনে
সচকিত ভালবাসার মহাঙ্গন।
কখন কখন ভেসে আসে দূর থেকে এক আবহ সঙ্গীতের
অনুরণন, 'ভালো আছ তো?'
এই মহাযজ্ঞের সাগ্নিক পুরোহিতরা
কেউ এসেছে তার অতীতকে ফিরে ফিরে দেখতে,
কেউ বা মিলে গেছে তার প্রায় হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে দেখতে পেয়ে
কেউ উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করে আছে, কখন তার পক্বকেশ বন্ধুটি,
আবার তাকে কলেজের রঙিন জীবনে রাঙিয়ে দিয়ে যাবে।
কেউ বা উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে তার অনেক দূরের যাত্রীকে আজও
আকুল হয়ে খুঁজে বেড়ায়।
যদিও জানে ঐ নাম না জানা পথে যেতে হবে একদিন তাকেও
জীবনের ধর্মই তো ভরপুর ভালোবাসায় ভরা।

পেলাম তোমাকে

রুণু ভট্টাচার্য্য

বোলপুরে পেলাম / তোমাকে পেলাম না,
তাই খুঁজতে খুঁজতে চলে গেলাম,
সেই ভুবন ভাঙার মাঠে
যেখানে তালগাছটা একপায়ে দাঁড়িয়ে,
সেখানেও তো তুমি নেই!
তবে কি খোয়াইএ আছো?
যেখানে ঝির ঝির করে চলেছে জল
ছোট্ট ছোট্ট টিলার তলায় তলায়
কোথাও গর্ত কোথাও নুড়ি,
টুপটুপ মহুয়া ঝরছে / ভেসে ভেসে চলেছে
না: সেখানেও তো তুমি নেই!
আবারও খুঁজতে চললাম্ / দূরে সোনাঝুরির বনে
হলুদ সবুজ পাতায় ফুলে/বোধহয় আছন্ন
ক্লান্ত বিপর্যস্ত – কোথাও নেই তুমি।
ফিরে এলাম ঘরে / দেখি একগুচ্ছ স্বর্ণচাঁপা,
বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাস / হাতে নিয়ে দেখি একি!!
এ যে রবীন্দ্রনাথ।

Fundamentals of all Religions

The Panchshila of Buddha

All the religions of the world are based on the fundamental principles of good conduct and prohibit their followers to indulge in the misconduct and misbehavior that may harm the society at large. So, the Panchshila of Buddha is comprised of the basic teachings of conduct which are as under:

1. No killing	Respect for life
2. No stealing	Respect for others' property
3. No sexual misconduct	Respect for our pure nature
4. No lying	Respect for honesty
5. No intoxicants	Respect for a clear mind

জীবন যে রকম

মানসী দে

শীতের হিমের পরশে ঘুমঘোর সুখ–স্বপ্নের,
আবেশে মুদিত আঁখিপল্লবে,
কে যেন দিল সশব্দ নাড়া।
ওঠো ওঠো চোখ খুলে দেখ।'
মিষ্টিমধুর আর মমতাভরা উদাত্ত স্বরে,
কে যেন ডাকছে বারে বারে তার স্নেহ মাখা মুখখানিতে!
উত্তাল হাওয়ার বেগে আলো ঝলমল দিনে,
উঠে পড়ি ধড়মড় করে।
বারে বারে শুধাই আমার মনকে,
কে যেন ডাকে আমায় এমন পাগলপারা করে।
কত আগ্রহ আর উদ্দীপনায় ভরপুর মন প্রাণ জুড়ে,
রয়েছে বছরের একটাই দিন,
তা হল আমাদের কলেজের পুনর্মিলন।
এধার–ওধার থেকে জড়ো হই আমরা সবাই,
যতজন আছি যেখানে, স্থানীয়, বিদেশী আর প্রবাসী,
প্রাক্তনী ভাইবোনেরা মিলে গড়ে তুলি এক মহা সম্মেলন।
হাসি আর আনন্দের ঝরনাতলায় বয়ে চলে–
স্বতঃস্ফূর্ত স্রোতধারা আর শান্ত ঢেউয়ের চকিত আলোড়ন।
মাঝে মাঝে সাদর, আন্তরিক সম্ভাষণ আর দরদভরা আত্মীয়তার
মেলবন্ধনে
সচকিত ভালবাসার মহাঙ্গন।
কখন কখন ভেসে আসে দূর থেকে এক আবহ সঙ্গীতের
অনুরণন, 'ভালো আছ তো?'
এই মহাযজ্ঞের সাগ্নিক পুরোহিতরা
কেউ এসেছে তার অতীতকে ফিরে ফিরে দেখতে,
কেউ বা মিলে গেছে তার প্রায় হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে দেখতে পেয়ে
কেউ উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করে আছে, কখন তার পক্বকেশ বন্ধুটি,
আবার তাকে কলেজের রঙিন জীবনে রাঙিয়ে দিয়ে যাবে।
কেউ বা উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে তার অনেক দূরের যাত্রীকে আজও
আকুল হয়ে খুঁজে বেড়ায়।
যদিও জানে ঐ নাম না জানা পথে যেতে হবে একদিন তাকেও
জীবনের ধর্মই তো ভরপুর ভালোবাসায় ভরা।

মানুষ হয়েছ যখন

অমর সিংহরায়

জাতিস্মর নও বলে
গতজন্মে কী হয়ে জন্মেছিলে–
মানুষ না পাখি, গাছ না সরীসৃপ,–
কিছুই জানোনা!

এ জন্মে মানুষ হয়ে জন্মেছ যখন ঈশ্বরী আনন্দে
তবে কেন করনা মানুষের কাজ–.....
হৃদয় উৎসারিত মণিমুক্তা বিলিয়ে দাওনা কেন
অকৃপণ অহরহ.....
কত দু:খী মন–তোমার হাসিতে
তোমার স্পর্শে, আনন্দে উদ্বেলিত হয়।
খুঁজে পায় জীবনের মানে।
প্রসারিত তোমার হাতে অনাথ কন্যার
ঘর বেঁধে দাও। ক্ষুধার্তকে দাও অন্নজল, মুমূষুকে ঔষধি।
দেখ জলঙ্গী–তোরসা ছুটে যায় জীবনের কি মায়াময় ছন্দে।
পাখিরা তোমারই গান গায়, ফুলেরা তোমারাই সুগন্ধ ছড়ায়।
যা' কিছু ক্রূরতা, হিংসা, প্রতিশোধ–স্পৃহা
ফুৎকারে ওড়াও
পুষ্প, চন্দন, তুলসী, কোশাকুশি ফেলে
পাথরের দেবতার মন্দির দ্বার রুদ্ধ কর।
স্থিতপ্রজ্ঞা দেবীর মতো
হৃদয় খুঁড়ে মণিমুক্তা, মায়া ও মমতা, ক্ষমা ও ভালোবাসা
বিলিয়ে দাও অকৃপণ অহরহ।
তুমি আগামী জন্মে কী হবে–
মানুষ না অন্য কিছু? জানোনা কিছুই।
এ জন্মেই মানুষের কাজ কর মানুষের জন্যে।

স্বামীজির কাছে চরিত্র স্বর্গীয় সম্পদ

যতীন্দ্র মোহন দত্ত

স্বামীজি যে পূর্ণ জ্ঞানী
জানে কি সবাই?
তার মত অক্লান্ত কর্মী ত্রিভূবনে নাই।
তিনি যে মহা যোগী
সমাধিমান একজন।
আবার পরম বিশ্ব প্রেমিক, স্বদেশ বৎসল সন্তান।
স্বজাতি বিজাতি বলে ছিলনা কিছু তাঁর কাছে,
তাঁর সমস্ত ভাই ভক্তরা তো
একথা জেনে গেছে।
ধনী নির্ধন পুরুষ স্ত্রী,
সাধু অসাধু তার ছিল না কোন দিন।
ভালবাসার বন্ধনে সবাইকে বেঁধে দিতেন।
কাহাকেও তাঁহার মহান হৃদয়
বাদ দিতে পারে নাই,
পাপী বা নাস্তিক হলেও
তার স্নেহ তো পাবেই।
দীন হীনের প্রশ্ন নেই যার মাঝে
পরমাত্মা আছে, দুর্বলভাই মানসিক রোগের বিষ
গীতার ভাষাই তো বলেছে।
তাঁর বাণী ''ধর্ম যদি মানুষকে মানুষ নাহি করে,
তোমরা যে অমৃতের সন্তান, কে বুঝিতে পারে?
তার কথায় ''সকলের সুখে দুঃখে সহানুভূতি চাই,
অপরের দুঃখ মোচন করার
স্বভাবটাতো গড়তে হবেই।

মানুষ হয়েছ যখন

অমর সিংহরায়

জাতিস্মর নও বলে
গতজন্মে কী হয়ে জন্মেছিলে–
মানুষ না পাখি, গাছ না সরীসৃপ,–
কিছুই জানোনা!

এ জন্মে মানুষ হয়ে জন্মেছ যখন ঈশ্বরী আনন্দে
তবে কেন করনা মানুষের কাজ–.....
হৃদয় উৎসারিত মণিমুক্তা বিলিয়ে দাওনা কেন
অকৃপণ অহরহ.....
কত দু:খী মন–তোমার হাসিতে
তোমার স্পর্শে, আনন্দে উদ্বেলিত হয়।
খুঁজে পায় জীবনের মানে।
প্রসারিত তোমার হাতে অনাথ কন্যার
ঘর বেঁধে দাও। ক্ষুধার্তকে দাও অন্নজল, মুমূষুকে ঔষধি।
দেখ জলঙ্গী–তোরসা ছুটে যায় জীবনের কি মায়াময় ছন্দে।
পাখিরা তোমারই গান গায়, ফুলেরা তোমারাই সুগন্ধ ছড়ায়।
যা' কিছু ক্রূরতা, হিংসা, প্রতিশোধ–স্পৃহা
ফুৎকারে ওড়াও
পুষ্প, চন্দন, তুলসী, কোশাকুশি ফেলে
পাথরের দেবতার মন্দির দ্বার রুদ্ধ কর।
স্থিতপ্রজ্ঞা দেবীর মতো
হৃদয় খুঁড়ে মণিমুক্তা, মায়া ও মমতা, ক্ষমা ও ভালোবাসা
বিলিয়ে দাও অকৃপণ অহরহ।
তুমি আগামী জন্মে কী হবে–
মানুষ না অন্য কিছু? জানোনা কিছুই।
এ জন্মেই মানুষের কাজ কর মানুষের জন্যে।

স্বামীজির কাছে চরিত্র স্বর্গীয় সম্পদ

যতীন্দ্র মোহন দত্ত

স্বামীজি যে পূর্ণ জ্ঞানী
জানে কি সবাই?
তার মত অক্লান্ত কর্মী ত্রিভূবনে নাই।
তিনি যে মহা যোগী
সমাধিমান একজন।
আবার পরম বিশ্ব প্রেমিক, স্বদেশ বৎসল সন্তান।
স্বজাতি বিজাতি বলে ছিলনা কিছু তাঁর কাছে,
তাঁর সমস্ত ভাই ভক্তরা তো
একথা জেনে গেছে।
ধনী নির্ধন পুরুষ স্ত্রী,
সাধু অসাধু তার ছিল না কোন দিন।
ভালবাসার বন্ধনে সবাইকে বেঁধে দিতেন।
কাহাকেও তাঁহার মহান হৃদয়
বাদ দিতে পারে নাই,
পাপী বা নাস্তিক হলেও
তার স্নেহ তো পাবেই।
দীন হীনের প্রশ্ন নেই যার মাঝে
পরমাত্মা আছে, দুর্বলতাই মানসিক রোগের বিষ
গীতার ভাষাই তো বলেছে।
তাঁর বাণী ''ধর্ম যদি মানুষকে মানুষ নাহি করে,
তোমরা যে অমৃতের সন্তান, কে বুঝিতে পারে?
তার কথায় ''সকলের সুখে দুঃখে সহানুভূতি চাই,
অপরের দুঃখ মোচন করার
স্বভাবটাতো গড়তে হবেই।

Swami Vivekananda as a Movement

- Prabhas Ranjan Biswas (Ex-Student)
B.A.(Hons)Econ 1962

It is 9th Feb, 2014, the sun rises with all its
Splender in the sky,
And throws its crimson radiance,
Over the central hall of the college,
The members of the Alumni Association glitter
Around chairmanship of the principal and patron-in-chief of the college,
On the eve of the 150th birth anniversary
Taking place in 2014
The country is strong and united,
Thou have taught how to defend its walls,
Thou have propounded the emancipation
Of the oppressed and the underprivileged,
Thou have created righteous people like Mr Amiya Mazumder, an illustrious
Philosopher and an ex-principal of the college,
And others as the torch-bearers of universal brotherhood,
As the morning dew refreshes its earth,
So, thy message does the same
For the members of the Alumni Association,
As sure as morning and sunrise.

--:: x ::--

(Shri P.R.Biswas was awarded Consolation prize for his essay on 'Reading the word and world – Literacy in the times of globalization' in category – "open for all" under the National Essay Competition on Adult Education/ Literacy organized by the Directorate of Adult Education, New Delhi for the year 2007-08)

Who is helping You, don't Forget them.
Who is loving you, don't Hate them.
Who is believing you, don't Cheat them.

আমার প্রিয় বিদ্যাপীঠ

কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজের কিছু স্মৃতি কথা

অম্বুজ মল্লিক মৌলিক

আজ থেকে ৭০/৭১ বছর আগেকার কথা যার কিছু কিছু এই নয়ের দশকের প্রবীণের মনে জ্বল জ্বল করছে কোনদিন ভুলিনি – আমার অত্যন্ত প্রিয় কলেজের কিছু কিছু আনন্দদায়ক স্মৃতিবত্ত, কত তৃপ্তির। সেটাই একটু লিখে প্রাক্তনী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দিতে আহ্বান জানালেন - মিলনীর সম্পাদক শ্রীখগেন দত্ত। তাই এই বয়সে একটু কলম ধরলাম।

সেটা ১৯৪৩/৪৪ সন - আমি এই কলেজে 3rd year (B. Sc) তে ভর্তি হলাম উত্তরপাড়া কলেজ থেকে I.Sc. পাশ করে। আমার সহপাঠীগণের মধ্যে খুব অন্তরঙ্গতা ছিল প্রয়াত সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল, প্রয়াত অমিয় সেন (B.E তে পরে Gold Medalest) সমর চৌধুরী প্রভৃতির মধ্যে। নারায়ণের বিষয়ে সকলেই জানেন W.B. Govt. এর Construction Board এর Superintending Engineer এর পদে ছিল ও সাহিত্যিক হিসাবে বিরাট কৃতিত্বের অধিকারী ছিল। সমর সম্ভবত Executive Engineer হয়ে Retire করে। তার সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি - কিন্তু নারায়ন ও অমিয় দুজনেই চিরবিদায় নিয়েছে। ওদের আত্মার শান্তি কামনা করি।

শেষ পরীক্ষাতে আমিও অমিয় Distiction পেয়েছিলাম - ওরা পরীক্ষার কয়েকমাস পূর্বে Honours ছেড়ে দেয়। যার জন্য Result খুব ভালো করা সম্ভব হয়নি বলে মনে হয়। কিন্তু দুজনেই খুব ভাল ছাত্র ছিল। নারায়ণের ঝোঁকছিল - প্রবন্ধ, কবিতা লেখার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার দিকে। কলেজের প্রায় সকল ছাত্রই - সব Year-এরই ওকে বেশ পছন্দ করত।

আমাদের এই কলেজের প্রচুর সুনাম ছিল। বহু গুনীজন এখান থেকে বেরিয়ে পরবর্তী জীবনে বিরাটভাবে প্রতিষ্ঠিত হন। আর এই কলেজেককে দূরের Main Road থেকে দেখলে কি সুন্দর মনে হয়। বিল্ডিংটি ছিল খুব সুন্দর তার সামনে ফুলবাগান-তারও সামনে বড় খেলার মাঠ-যে মাঠে খেলেও অনেকে নামীদামী ক্লাব থেকে ডাক পেয়েছেন।

আমার সময়ে যে শিক্ষাগুরুদের আমরা পেয়েছিলাম - তাঁদের শিক্ষাদান ছিল অতুলনীয়।

প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন - J.M.Sen - তুলনাহীন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন Administrator - অথচ কোনোদিন কাউকে রাগ করে কিছু বকাবকি করেছেন বলেও শুনিনি। সবাই কিন্তু বাঘের মতো ওকে ভয় পেতেন - যদিও ওর দ্বারা কারো কোনোদিন কিছু ক্ষতি হয়েছে বলে - আমি তো অন্তত শুনিনি। তারপর ওঁর কলেজে বহু ছাত্র হয়তো Principal-এর দেখাই পায়নি - কিন্তু উনি সম্ভবত প্রতিটি ছাত্রের সকল খবরই রাখতেন - যাকে বলা যায় হাঁড়ির খবর। এর প্রমাণ আমি পরে দিচ্ছি।

আমরা ছিলাম Pure Science অর্থাৎ Physics Chemistry, Mathmeties এর ছাত্র। সে সময়ে

আমরা যে কজন Professor পেয়েছিলাম তাঁরা একবার কোনো বিষয়ে কিছু Class এ পড়ালে – ছাত্ররা অভিভূত হয়ে শুনতো। Note নিত – আর সম্ভবত ভুলতেও পারত না। আমার সৌভাগ্য – Physics এ Mr. S.N. Roy, Mathmeties এ Mr. A. Kahali (ওঁর ছেলেও আমার সহপাঠী পরে সম্ভবত সেও Professor হয়েছিল) আর Chemistry তে Dr. Sengupta লক্ষ্য করেছি একটা Extra কথা Goosiping বা অন্য কোনোভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরুত না। Class এ আসতেন, সুন্দরভাবে পড়াতেন। বোঝাতেন Period শেষে চলে যেতেন। অপূর্ব শিক্ষাদান। প্রচন্ড ব্যক্তিত্বপূর্ণ। ৫৩ বছর বয়সে City College–এ transfer হবার পর নাকি তিনি প্রথম বিবাহ করেন। কাজ ব্যতীত কিছুই বুঝতেন না। বলে আমরা বলাবলি করতাম।

এঁদের প্রত্যেকের Talent/Quality আমাদের মুগ্ধ করত। ভক্তি করতাম। ভয়ও পেতাম। এঁদের কাছে না পড়লে হয়ত আমরা বেশী এগোতেই পারতাম না। যদি ঠিক মনে করতে পারি কৃষ্ণনগরের গর্ব শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র। হাইকোর্টের Advocate ও পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীত্বও করেন – আমাদের এক বছরের Junior ছিলেন। তিনি কলেজকে মাতিয়ে রাখতেন। স্বচ্ছ সমাজসেবার কাজও করেছেন – তাঁর পিতা লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের (M.P.P.) পথ অনুসরণ করে – তাঁকে এ বৎসরের পূনর্মিলন উৎসবে দেখতে পেলে বড় আনন্দ পাব – তৃপ্ত হব। তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি। এটাও আমার এক স্মৃতির উদাহরণ।

অপর দুটি স্মৃতি নিম্নে বর্ননা করছি – এবং হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে এ দুটো বেরিয়ে আসে – সব হুবহু মনে আছে এই ৭০ বছর পরে আমার ৯০ পেরুবার পরেও।

প্রথমত আমাদের প্রিন্সিপাল Mr. J.M. Sen এর ব্যাপার – যাঁকে আমরা জানতাম ভাল Administrator এর কারো সাতে পাঁছে থাকতেন না।

হঠাৎ একটা ক্লাস শেষে একজন কলেজের 'বেয়ারা' (তখন এই নামই ছিল) আমায় বলল – 'প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তোমায় তাঁর চেম্বারে ডেকেছেন।' সর্ব্বনাশ, এ কি কথা? কি অপরাধ করলাম? আর আমাকে চিনলেনই বা কি করে? আমি তো কৃষ্ণনগরে থাকিনা। নবদ্বীপের এপারে স্বরূপগঞ্জের টোল অফিসের (এখন সম্ভবত Guest House) পাশে দাদামশায়ের কাছে থাকি। সকালে ৬–৮টা একজন Class X-এর ছাত্রীকে পড়াই, ও সন্ধ্যা ৬–৮টা তাঁর দাদা অমিয় ব্যানার্জ্জী 2nd year I.Sc. র ছাত্রকে পড়াই। সকাল ৯টায় ১কিলোমিটার হেঁটে নবদ্বীপ ছোট স্টেশনে ছোট রেলে চেপে কৃষ্ণনগর রোড স্টেশনে নেমে প্রায় ২ কি.মি. হেঁটে কলেজে এসে ক্লাস করি ও ঠিক ঐভাবে ছুটির পরে স্বরূপগঞ্জ ফিরি। পড়াশুনা বেশীর ভাগই রাত্রে হারিকেনের আলোয় মশারীর ভিতরে বিছানায় বসে বা শুয়ে। অবশ্য নবদ্বীপ থেকে 4th year এর একজন ও আমার সহপাঠী একজন আমার প্রাত্যহিক সঙ্গী ছিল। ওদের সঙ্গে গল্প বা পড়াশুনার আলোচনা করতে করতে যাতায়াতে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করিনি। আমাকে Principal কি করে চিনবেন বা নাম জানবেন?

নারায়ণ, অমিয়কে বললাম – 'কেন রে বল্‌বো?' ওরা বলল – 'বুঝতে পারছি না – তবে উনি কারো ক্ষতি করেন না। ভয় পাস না দেখা ক'রে আয় – আমরা Common Room এ তোর জন্য অপেক্ষা করা।'

একটু ভয় কাটল – তবুও পা যে একটু একটু কাঁপছে? যা হবার হোক ভেবে বলির পাঁঠার মতো ওঁর চেম্বারে ঢোকার বিরাট উঁচু দরজার কাছে এসে টুলে বসে থাকা বেয়ারাকে বললাম 'আমি দেখা করব – সাহেবকে একটু জানাবে?' নামও বললাম।

বেয়ারা ঘুরে এসে বলল – 'যাও'। আমি দরজার একটা পাল্লা একটু ফাঁক করে কোনোক্রমে উচ্চারণ করে ফেললাম 'May I come in Sir?' সিংহের গর্জন কোনদিন শুনিনি। একটা গর্জনের মতো শব্দ হল (সম্ভবত অতবড় হল ঘরে Sound টা Rebound করে আমার কাছে আসে বলেই ওটাকে গর্জন ভেবেছিলাম) 'Yes'।

প্রায়কম্পমান পদযুগল অতি ধীরে সেন সাহেব বা 'সিংহ' সাহেবের টেবিলের থেকে একটু দূরে থেমে গেল। উনি আমায় ভালভাবে জরীপ করলেন মনে হল। এবার Attack টা কোনখান থেকে হবে ভাবছি – বলে উঠলেন – 'তুমিই তো অম্বুজ মৌলিক?' 'হ্যাঁ স্যার'। অবাক ক'রে তাঁর জিজ্ঞাসা 'সব Reference বই তুমি Collect করতে পারনি? আর তুমি স্বরূপগঞ্জ থেকে প্রতিদিন যাতায়াত কর? 'Yes Sir,' আমার সামান্য সাহসী গলায় উত্তর।

উনি হাতের তালু দিয়ে টেবিলে রাখা 'সেই ঠুং ঠুং Calling Bill বাজালে – হন্তদন্ত হয়ে বেয়ারা উঁকি দিল। উনি তাঁকে Order করলেন Libraian কে ডাকতে। Libraian কেও মনে হল আমার মতই বলির পাঁঠার মতো এসে দাঁড়াতে। Principal সাহেব আমাকে দেখিয়ে বললেন 'একে চিনে রাখুন – এ যখন যে বই চাইবে Issue করবেন আমার নামে আর যতদিন রাখতে চায় – তাগাদা করবেন না।' 'হ্যাঁ Sir' ব'লে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ Libraian এর। আমাকে জানালেন – 'বইয়ের যেন কোনো ক্ষতি না হয় – তার কাজ শেষে ফেরৎ দিয়ে যাবে। তোমার সময় খুব কম ২টা Tuition করো – একটু Steadily এগিয়ে চল – কোনো অসুবিধা হলে জানাবে।'

ঈশ্বরকে মনে মনে বললাম – 'এইতো স্বর্গ'। হাতজোড় করে বিদায় নিলাম।

প্রায় মৃত অবস্থা থেকে যদি কেউ জীবন ফিরে পেয়ে। বেশ সুস্থ সবল হয়ে ওঠে – তার যে মনের অবস্থা হয় – আমারও এই কলেজে একবার সেরকমই হয়েছিল। ঘটনা হচ্ছে – বি.এস.সি. ফ্যাইন্যাল পরীক্ষা শেষে Chemistry Practical পরীক্ষা হচ্ছে। আমরা ২৮/৩০ জন ও ১টি সহপাঠিনী Laboratory তে পরীক্ষা দিতে বসেছি। তদারকি করছেন – প্রফেসর ডঃ সেনগুপ্ত ও বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের থেকে External Professer একজন।

আমার যতদূর মনে পড়ে (১৯৪৪) Lead Nitrate Salt পেয়ে খাতায় কি এবং কেমন করে বার করলাম – তার Details লিখছি। কিন্তু বার বারই Distributed fell করছি – যখন Dr. Sengupta অন্য কারো খাতায় উঁকি দিয়ে লক্ষ্য না করে আমার পিছন থেকেই কয়েকবার উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছেন বলে আমার মনে হচ্ছে। একটু যে Nervoursness আসেনি – সে কথা তার করে বলতে পারবো না।

পরীক্ষা শেষে আমি, নারায়ন, অমিয়, সমর ও আরও কয়েকজন Laboratory থেকে বেরিয়ে, আসছি – হঠাৎ Chemistry Department এর বেয়ারা এসে আমায় বলেলা। 'তোমাকে সেনগুপ্ত সাহেব তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে যেতে বললেন।' আমার রক্ত চলাচল প্রায় বন্ধ হবার জোগাড় মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না – কারণ ভাবছি অন্য কাউকে ডাকলেন না – আমাকেই দরকার পড়লো। তাহলে আমি ভুল Salt সম্বন্ধে লিখেছি বা বার করেছি। সেজন্যই আমার খাতা বার বার লক্ষ্য করেছিলেন। কি করব ভাবছি। অমিয়রা বলল – 'কি দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? যেতে তো হবেই – যা দেখা করে আয়। – আমরা তোর জন্য Common Room এ থাকব। একসঙ্গে ফিরব। যা ভয় পাচ্ছিস কেন?...'

মনে হল শরশয্যা পাতা আছে – এবারে তার উপরে আমায় বিশ্রাম নিতে হবে – আস্তে আস্তে ওর ঘরের দিকে এগুলাম। দরজা খোলাই ছিল। দু'তিন পা এগিয়ে ওঁর চেয়ারের পাশে একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। চোখের সামনে যেতে সাহস পেলাম না।

ডঃ সেনগুপ্ত টেবিলে কিছু লেখালেখি করছিলেন – আমার আসার শব্দ হয়তো অনুভব করেছেন। একবার সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে আমায় দেখলেন – তাও আড়চোখে। তারপর যা করলেন – আমার জীবন ফিরে এলো, রক্ত চলাচল অস্বাভাবিক বেড়ে গেলো। মনে হল একটু ঠোঁটে মুচকি হাসি দিয়ে, হাতের কলম রেখে ডান হাত দিয়ে আমার বাঁ কাঁধে দুবার টোকা দিয়ে বলে উঠলেন "Well Done" আবার লেখায় মন দিলেন। আমি তো শরশয্যা ছেড়ে তখন আকাশে উঠছি – সম্ভবত আর একটু উঠলে স্বর্গেই পৌছতাম হাট ফেল করে। প্রনাম করতে গেলাম –হাত দিয়ে বারণ করলেন।

ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলাম – মনে হয় এক লাফে তিন পা এগিয়ে দরজার বাইরে পৌছলাম – Common Room এ ছুটে গেলাম। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা চোখে দেখছে সব বললাম। ওরা হাতটি ধরে বলল Congratulations কি খাওয়াবি? ....'

Result বেরুলে দেখা গেল আমি University তে Practical Chemmistry তে (তখন একমাত্র University ছিল Calcutta University) 2nd করেছি বহরমপুরের একজন 98% আর আমি 96% মনে মনে Dr. Sengupta কে প্রণাম ও College কে কৃতজ্ঞতা জানালাম।

এমনই ছিলেন আমাদের সরকার অধ্যাপক বা স্কুলের শিক্ষকগণ। এ ব্যাপারে আজকের পরিস্থিতি – বিশেষত শিক্ষার ব্যাপারে দুটি উদাহরণ দেব আমার জীবনে যা ঘটেছিল। তবে এই কলেজের নয় – স্কুল জীবনে। জানি না কলেজ সম্বন্ধে কিছু জানতে গিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়াটা সম্পাদক মেনে নেবেন কিনা – তবুও তখনকার শিক্ষাগুরু আর আজকের (সকলে নন) শিক্ষকের মধ্যে একটা তুলনামূলক অবস্থা বা পরিবেশ আমি জানিয়ে রাখি – ওরা ইচ্ছা হলে লেখাটা রাখতেও পারেন কেটে দিতেও পারেন – আমার দুটোতেই মত রইল।

এক নম্বরটা হল–আমি ১৯৩৯/৪০ তে দত্ত পুকুরের নিবাধুই হাইস্কুলের Class IX/X এর ছাত্র ছিলাম। সবশুদ্ধ প্রায় ৪০ জনের Class X এর মধ্যে আমি একজন। Matriculation পরীক্ষার জন্য Test হতো (এখনও হয়তো হয় – জানি না) আমরা পরীক্ষার পরে যেদিন Result বেরুবে (Test এ কতজন

Allowed for Matriculation Final Exam.) সকলেই দেখতে গেলাম। সম্ভবত ৩৪/৩৫ জন allowed হয়েছিল। আমার নামটা অবশ্য এক নম্বরেই ছিল - তারপর ভানু। হৃষিকেশ অফিসার এভাবে পরপর নামগুলো List এ দেখলাম। সকলে হৈ চৈ করে বেরুতে যাচ্ছে – একজন ক্রম আমাদের ১ নং থেকে ৬ নং পর্যন্ত ৬ জনকে হেড মাস্টার মশায় তাঁর ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন ব'লে গেলেন। আমরা ৬ জনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি – বুঝতে পারছিনা কেন ডাকলেন।

হেড মাস্টার ছিলেন গণেশ দত্ত – ট্রিপল এম.এ. বি.এল., বি.টি– বিপুল জ্ঞানী ও খুন নম্রস্বভাবের – যদিও নিবাধুই গ্রামের লোকেরা ওঁর চেহারা ও গলার স্বরের জন্য নাম দিয়েছিল – 'মহিষাসুর'। বিরাট চেহারা – মোটা, কালো কুচ্‌কুচে, মুখটাও খুব বড় মাথা সহ গলার স্বরও ছিল বাঘের ডাকের মতো। কিন্তু এত বিনয়ী. পরোপকারী ও ধীরস্থির স্বভাবের জন্য আমি অন্তত তাঁকে হৃদয়ের অতি উচ্চাসনে বসিয়ে রেখেছিলাম।

ওর অফিস ঘরে ঢুকলাম ৬ জনে। উনি একটাই কথা বললেন – আমার ভাড়াবাড়ীতে ৬ জনের বেশী বসার জায়গা নেই – তাই List এর ওপরের ৬ জনকে বেছেছি। তোরা তো এই তিনমাস ফাঁকি দিয়ে কাটাবি। এক কাজ কর – তোরা প্রতিদিন আমার বাড়ীতে বিকেল ৩টায় চলে আসবি – আমি তোদের একটু দেখিয়ে টেখিয়ে দেব। কাল থেকেই আরম্ভ কর।'

যেতাম প্রতিদিন ঐ ৬ জন। স্যারের স্ত্রী ব্যতীত আর কেউ ছিলেন না – কোনো সন্তান হয়নি। ওঁর বয়স তখন প্রায় ৫৫ হবে। প্রতিদিন প্রায় ৮টা রাত্রি পর্যন্ত প্রতিটি পড়া বোঝাতেন। উত্তর লিখতে বলতেন – ভুল সংশোধন করে দিতেন। ইতিমধ্যে চোরের ব্যাপার তখন এত ব্যস্ত হয়নি। চিঁড়ে ভাজা বা মুড়ি বা ছাতুমাথা এক একদিন এক এক রকম খাবার সন্ধ্যায় আমাদের জন্য বরাদ্দ ছিল। মাহিনা বা কোনো কিছু দেওয়া বারণ ছিল। একদিন অফসার একটা কচি লাও নিয়ে পড়তে এসেছে – স্যার জিজ্ঞাসা করলেন – ওটা কিরে? অফিসার মুখ কাঁচুমাচু করে কোনোক্রমে উচ্চারন করল – 'একটা কচি লাও – মাচায় হয়েছে – মা আপনার জন্য পাঠিয়েছেন।' উনি বললেন- 'কি, আমায় ঘুষ দিচ্ছিস? আমি আর তোকে পড়াব না।'

মিসেস দত্ত (প্রায় ৫০) আমাদের জন্য খাবার দিতে এসে সব শুনলেন – পরে স্যারকে বললেন 'ওকে কিছু বলো না – ও কাঁদছে দ্যাখো। এবারে ক্ষমা করে দাও। আর কেউ যেন কোনো দিন কিছু এনোনা। ওর মায়েরও কষ্ট হবে না নিলে – তাই আমি নিলাম।'

এভাবে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংসে সিট পড়ার খবর পাওয়া পর্য্যন্ত পায় ২ মাস আমাদের উনি তৈরী করেছিলেন – প্রত্যেকে বেশ ভাল Result করেছিলাম। আমার তিনটি লেটার ছিল ও সব Subject এই Letter এর কাছাকাছি ছিল।

আজও তাঁকে মনে পড়ে আর মনে এলেই চোখ ছলছল করে – প্রনাম করতে ইচ্ছা হয়। আর যারা 'মহিষাসুর' নাম দিয়েছিল – তাদের প্রতি ঘৃণা আসতো মনে। ওর আত্মা শান্তিতে থাকুক। এই লেখার মধ্য দিয়ে প্রনাম জানাই।

দ্বিতীয় নম্বরটা হল – ১৯৩৭/৩৮ ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ীর R.S.K. Institution ওখানে

পরীক্ষা শেষে আমি, নারায়ন, অমিয়, সমর ও আরও কয়েকজন Laboratory থেকে বেরিয়ে, আসছি – হঠাৎ Chemistry Department এর বেয়ারা এসে আমায় বললো। 'তোমাকে সেনগুপ্ত সাহেব তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে যেতে বললেন।' আমার রক্ত চলাচল প্রায় বন্ধ হবার জোগাড় মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না – কারণ ভাবছি অন্য কাউকে ডাকলেন না – আমাকেই দরকার পড়লো। তাহলে আমি ভুল Salt সম্বন্ধে লিখেছি বা বার করেছি। সেজন্যই আমার খাতা বার বার লক্ষ্য করেছিলেন। কি করব ভাবছি। অমিয়রা বলল – 'কি দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? যেতে তো হবেই – যা দেখা করে আয়। – আমরা তোর জন্য Common Room এ থাকব। একসঙ্গে ফিরব। যা ভয় পাচ্ছিস কেন?...'

মনে হল শরশয্যা পাতা আছে – এবারে তার উপরে আমায় বিশ্রাম নিতে হবে – আস্তে আস্তে ওর ঘরের দিকে এগুলাম। দরজা খোলাই ছিল। দু'তিন পা এগিয়ে ওঁর চেয়ারের পাশে একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। চোখের সামনে যেতে সাহস পেলাম না।

ডঃ সেনগুপ্ত টেবিলে কিছু লেখালেখি করছিলেন – আমার আসার শব্দ হয়তো অনুভব করেছেন। একবার সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে আমায় দেখলেন – তাও আড়চোখে। তারপর যা করলেন – আমার জীবন ফিরে এলো, রক্ত চলাচল অস্বাভাবিক বেড়ে গেলো। মনে হল একটু ঠোঁটে মুচকি হাসি দিয়ে, হাতের কলম রেখে ডান হাত দিয়ে আমার বাঁ কাঁধে দুবার টোকা দিয়ে বলে উঠলেন "Well Done" আবার লেখায় মন দিলেন। আমি তো শরশয্যা ছেড়ে তখন আকাশে উঠছি – সম্ভবত আর একটু উঠলে স্বর্গেই পৌঁছতাম হাট ফেল করে। প্রনাম করতে গেলাম –হাত দিয়ে বারণ করলেন।

ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলাম – মনে হয় এক লাফে তিন পা এগিয়ে দরজার বাইরে পৌঁছলাম – Common Room এ ছুটে গেলাম। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা চোখে দেখছে সব বললাম। ওরা হাতটি ধরে বলল Congratulations কি খাওয়াবি? ....'

Result বেরুলে দেখা গেল আমি University তে Practical Chemmistry তে (তখন একমাত্র University ছিল Calcutta University) 2nd করেছি বহরমপুরের একজন 98% আর আমি 96% মনে মনে Dr. Sengupta কে প্রণাম ও College কে কৃতজ্ঞতা জানালাম।

এমনই ছিলেন আমাদের সরকার অধ্যাপক বা স্কুলের শিক্ষকগণ। এ ব্যাপারে আজকের পরিস্থিতি – বিশেষত শিক্ষার ব্যাপারে দুটি উদাহরণ দেব আমার জীবনে যা ঘটেছিল। তবে এই কলেজের নয় – স্কুল জীবনে। জানি না কলেজ সম্বন্ধে কিছু জানতে গিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়াটা সম্পাদক মেনে নেবেন কিনা – তবুও তখনকার শিক্ষাগুরু আর আজকের (সকলে নন) শিক্ষকের মধ্যে একটা তুলনামূলক অবস্থা বা পরিবেশ আমি জানিয়ে রাখি – ওরা ইচ্ছা হলে লেখাটা রাখতেও পারেন কেটে দিতেও পারেন – আমার দুটোতেই মত রইল।

এক নম্বরটা হল–আমি ১৯৩৯/৪০ তে দত্ত পুকুরের নিবাধুই হাইস্কুলের Class IX/X এর ছাত্র ছিলাম। সবশুদ্ধ প্রায় ৪০ জনের Class X এর মধ্যে আমি একজন। Matriculation পরীক্ষার জন্য Test হতো (এখনও হয়তো হয় – জানি না) আমরা পরীক্ষার পরে যেদিন Result বেরুবে (Test এ কতজন

ছোটকাকা রাজবাড়ী রেলষ্টেশনের A.S.M. ছিলেন। বিরাট Station; প্রতিদিন গোয়ালন্দ ঘাটের পদ্মার ১/২ সেরের ইলিশ প্রায় ৫০০/৬০০ ঝুড়ি বিভিন্ন জায়গায়, কোলকাতাও বাদ নয় – Booking হত। একদিন Station এর ভাগাভাগিতে ২৯টা ইলিশ ছোটকাকার ভাগে পড়ে – এভাবে প্রত্যহই ১০–১৫–২০টা পাওয়া যেত। ইলিশ খেতে খেতে অরুচি হয়ে গেছিল। বাজারে একহালি (৪টে ঐ সাইজের) বিক্রী হতো ৬৪ পয়সার এক টাকায়। এখন যা শোনা যায় ওখানে এক সেরের দাম নাকি ৮০০/১০০০। বাংলাদেশী টাকায়। এ লেখাটা অবশ্য বাহুল্য হয়ে গেল তবে অত্যাশ্চর্য লাগবে অনেকের কাছেই তাই জানালাম।

স্কুলে হেড মাস্টার মশায় ছিলেন ত্রৈলোক্য ভট্টাচার্য্য (ইনিও সন্তানহীন) ও অঙ্কের মাস্টার ছিলেন উপেন স্যার। দুজনে আমাকে নিজের সন্তানের মতন দেখতেন। ও দুজনেই সুযোগ পেলেই – প্রশ্নোত্তর করাতেন। Class VII থেকে Class VIII এ উঠতে আমি নাকি রেকর্ড মার্কস পেয়েছিলাম – জানি না রেকর্ড কি ছিল?

হঠাৎ কাকা মারা গেলেন। বাবা আমাদের আনতে গেলেন (যশোর জেলা থেকে)। হেড স্যার বলেছিলেন – 'ওকে নিয়ে যাবেন না। আমি ওকে সন্তানের মত মানুষ করব – নিজে ওকে পড়িয়ে Matric Examination এ ওকে প্রথম ২০ জনের মধ্যে এনে দেবো। আর ছুটিতে কাউকে সঙ্গে দিয়ে বাড়ী পাঠাব – ছুটি শেষে নিয়ে আসব। কিছুই ভাববেন না ওর জন্য। ওকে এমনভাবে তৈরী করে দেব ওর জন্য আপনারা গর্ববোধ করবেন।

ভাগ্যে নেই হয়নি– বাবা রাজী হয়নি – এইটুকু ছেলে মাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। আপনারা তখন কষ্ট পাবেন। নিয়ে চলে এলেন।

বলুন তো এপরিবেশ কি শিক্ষাক্ষেত্রে আজকের দিনে কোথাও পাবেন?

আমার দীর্ঘ পথ চলার বাঁকে বাঁকে এরকম অনেক হীরে, মুক্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তার মধ্যে কয়েকটি তুলে ধরতে পেরে এবং আমার প্রিয় কলেজের প্রতি গভীর মমত্ব জ্ঞাপন করে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

কামনা করি সকলেই এ কলেজের সুখে দুঃখে যেন জড়িয়ে থাকেন।

Vedic "DHARMA" - ITS WIDER MEANING AND CONNOTATIONS

<u>Derivation and meaning of the word 'Dharma'</u>

The word 'dharma' (धर्म) in Sanskrit is derived from the root धृ meaning 'to hold', 'to bear', 'to carry' or 'to support'. धारणात् धर्मः - that which holds together or supports is *dharma*. In this sense *dharma* encompasses all ethical, moral, social and other values or principles, code of conduct and behavior which contribute to the well-being, sustenance and harmonious functioning of individuals, societies and nations and which prevent their disintegration. In a wider sense it is *dharma* which sustains and supports the whole world. This word has gathered around itself such richness of meaning and wealth of associations that it is impossible to translate it into a single word in any other language, Indian or foreign.

নিরুত্তর

প্রশান্ত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৬৬–৬৯)

আমাদের দেশে কয়েকটি অতীব সুপ্রাচীন সংস্কৃত প্রবচন বিদ্যমান যে প্রবচন গুলির ব্যাকরণের যাথার্থ্য নিয়ে চিত্ত সংশয়াকুল হয়। কিন্তু সুপ্রাচীন প্রবচনগুলি বিদ্বৎসমাজে এমনকি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। দীর্ঘকাল ঐ সব প্রবচন এতই জনপ্রিয় যে– ইহাদের কোনো বিকল্প অথবা সংশোধিত রূপ পরিলক্ষিত হয় না বা ঐ সকল প্রবচনগুলি আর্ষপ্রয়োগরূপে স্বীকৃত নয়। কয়েকটি আলোচনা সাপেক্ষে উদ্ধৃত হইল।

যেমন প্রায়শই কথ্য বা লিখিত ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়– **'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'** এখানে প্রশ্ন বস্ ধাতু পরস্মৈপদী তাহা হইলে ইহার আত্মনেপদরূপ কী প্রকারে বহুল প্রচলিত এবং প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ এই রূপ প্রয়োগ কাম্য।

দ্বিতীয় আর একটি প্রবচন যাহা বহুল প্রচলিত এবং প্রসিদ্ধ তাহা হইল **"যঃ পলায়তি স জীবতি"** এক্ষণে মনে প্রশ্ন জাগে পলায়ন করে এই অর্থে ধাতুর পরস্মৈপদীরূপ ব্যাকরণ সম্মত নয়। অর্থাৎ প্রবচনটির শুদ্ধরূপ হওয়া উচিত–**'যঃ পলায়তে সঃ জীবতি"** । আর একটি সংস্কৃত প্রবচন যাহা আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে অর্থাৎ ভারতবর্ষের সরকারী প্রশাসন–আদালত এবং রাষ্ট্রিয় প্রতীকে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ–**"সত্যমেব জয়তে"** যেহেতু জি ধাতু পরস্মৈপদী সেহেতু ইহার ব্যকরণশিষ্ট প্রয়োগ হওয়া উচিত **"সত্যমেব জয়তি"**। জি ধাতু যখন আত্মনেপদ হয় যখন বি-পরা প্রভৃতি উপসর্গের প্রয়োগ হয়। যেমন সঃ পাপাৎ পরাজয়তে বিজয়তাং মহারাজঃ শূত্রকঃ ইত্যাদি।

আমি এই সরল সন্দিগ্ধ শিষ্ট প্রয়োগ সম্মন্ধে বহু বিদ্বর্জ্জনে অথবা বহুশাস্ত্রবিজ্ঞ সুধীকে জ্ঞানপিপাসা নিবারণের জন্য জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম এবং বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ছিলাম কিন্তু কোনো প্রকার সদুত্তর লাভ করি–নাই। কেহ যদি উপরি উক্ত প্রয়োগ বিষয়ে আমার সংশয় নিবারণ করিতে সক্ষম হন সেই কারণে আমার এই প্রসঙ্গের অবতারণা। আমি তাহা হইলে অত্যন্ত উপকৃত এবং সম্যক জ্ঞান লাভে সমর্থ হই–ইহাই আমার একামাত্র আর্তি।

কিছু পুরাতনী

KRISHNAGAR COLLEGE 1846

MDCCCLVI

– গৌরীশংকর সরকার
(প্রাক্তন ছাত্র (১৯৪৭–৫১)

আজ যে কলেজের ইতিবৃত্ত লিখতে বসেছি আদতে তার নাম ছিল কৃষ্ণনগর কলেজ। কলেজটি অনুমোদনও পেয়েছিল কৃষ্ণনগর কলেজ নামেই সেই সুদূর অতীতে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে। বিগত শতাব্দির আটের দশকের শেষের দিকে হঠাৎই একদিন দেখা গেল কোন এক অজ্ঞাত কারণে কৃষ্ণনগর কলেজের নামের মধ্যখানে গভর্নমেন্ট শব্দটি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। এইভাবে এক কলমের খোঁচায় একটা ইতিহাসকে মুছে দেওয়া হল। ইতিহাসের পাতা উল্টালে জানা যায় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে হাজী মহম্মদ মহসীনের আর্থিক সহায়তা ও ভারতে সরকারের উদ্যোগে হুগলীতে একটি কলেজ চালু হলে তৎকালীন নদীয়ারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় মহোদয় কৃষ্ণনগরেও একটা কলেজ স্থাপনে উৎসাহিত হয়ে উঠেন। সেই মত তিনি তৎকালীন ভারতের বড়লার্ট লর্ড অকল্যান্ডের নিকট এক আবেদনপত্রও পেশ করেন। তখন কোলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী। কিন্তু দু:খের বিষয় বড়লার্ট লর্ড অকল্যান্ড ঐ আবেদনপত্র নাকচ করে দেন। অবশ্য সপারিষদ বড়লার্টের ঘোষণায় বলা হয়েছিল ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর থেকে কৃষ্ণনগরে একটি কলেজ ও বর্ধমানে ও বাঁকুড়ায় একটি করে বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। লর্ড হেনরী হার্ডিঞ্জ যখন ভারতের বড়লাট, সইসময় উত্তরপূর্ব ভারতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে ১০১টি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট এক আবেদনপত্র পুনরায় হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ মি: লরেন্স ক্লায়েন্টের মারফৎ পেশ করেন। ঐ আবেদনপত্রে সই করেন মনোমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন ঘোষ, তখন তিনি সদর আমীন। সেকালে সব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে সদর আমীন বলা হত। তিনি ছাড়াও, রামতনু লাহিড়ী ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারও স্বাক্ষর করেছিলেন ঐ আবেদনপত্রে। অবশেষে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে কৃষ্ণনগরে 'কৃষ্ণনগর কলেজ' নামেই একটি কলেজ স্থাপনের অনুমতি দেন ১লা জানুয়ারী ১৮৪৬ থেকে। পৌরভবন ও প্রাথমিক শিক্ষক–শিক্ষণ সংস্থার পশ্চিমদিকে এক প্রাসাদোপম ভবনে কলেজ চালু হয়। তখন ঐ অঞ্চলে ঐ ভবন ছাড়া আর বসতি ছিলনা কোন। ক্যাপ্টেন ভি, এল, রিচার্ডসন কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তৎকালে কলেজ জুনিয়ার ও সিনিয়ার এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। জুনিয়ার বিভাগের প্রধান ছিলেন মি: উইলিয়াম মাষ্টার। ইনি সিনিয়ার বিভাগেও অধ্যাপনা করতেন। মাষ্টার সাহেব থাকতেন বর্তমান ষ্টেডিয়ামের উত্তরে রামকৃষ্ণ আশ্রম যেখানে সেইখানে এক বিরাট প্রাঙ্গনের মধ্যে সুন্দর এক বাংলো বাড়ীতে। তাই ঐ অঞ্চলের নাম হয়ে যায় মাষ্টারহাতা। ইনি ছাড়াও আরও তিনজন ইউরোপীয়ান শিক্ষক ছিলেন কলেজে, যথা- মি: জন বিটসন, মি: লরেন্স বিনল্যান্ড ও মি: ফেডারিক জন ব্রাডবেরি। ভারতীয় শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামতনু লাহিড়ী, শ্রীপতি রায় প্রমুখেরা। কলেজ পরিচালনার জন্য সরকারী তরফে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এক কমিটি তৈরী করা হয়।

১) মি: ই, টি ট্রেভার– জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর – সভাপতি।
২) মি. ভি. জে মোনি– জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটর।
৩) মি. জে. সি. ব্রাউন– সেসন ও দায়রা জজ।
৪) ড: সি. আচার- সিভিল সার্জন
৫) মহারাজা শিরিশচন্দ্র রায়

৬) শ্রীরামলোচন ঘোষ

৭) ক্যাপ্টেন ডি. এন. রিচার্ডসন – সম্পাদক।

এই কমিটি গঠিত হয় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তারিখে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র একশত বিঘা জমির উপর বর্তমান কলেজ ভবন (গ্রীকো রোমান প্যাটার্নের) নির্মাণ ক'রে তাহা সরকারকে দান করলে তথায় কৃষ্ণনগর কলেজ স্থানান্তরিত হয়। শুনা যায় কলেজ ভবন নির্মাণে ১৭০০০ টাকা জনগণের দানের মধ্যে উলোর (বীরনগর) শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় ২,৫০০টাকা ও শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ১০০০ টাকা দান করেছিলেন। প্রথমদিকে কলেজের ছাত্র সংখ্যা ছিল–২৪৬ জন, তারমধ্যে ৮ জন মাত্র ছিল কলেজ ছাত্র। অবশেষে ছাত্রাধিক্যের জন্য ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের জুনিয়ার সেকশনকে সম্পূর্ণ পৃথক করে কলিজিয়েট স্কুল নাম দিয়ে নিকটবর্তী একদা দ্য বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানীর বোর্ডিং 'ইন্ডিগো হাউস' বা 'মূলহ্যাট হাউসে' স্থানান্তরিত হয়। তখন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জ্যাঠামশাই শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বসু। বর্তমানে কলেজ হোষ্টেলের দক্ষিণের মাঠটির ছিল জুনিয়ার বিভাগের খেলার মাঠ। কলেজ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে গেলে কলেজের পরিত্যক্ত স্থানটির নাম হয়ে যায় পুরোনো কলেজের হাতা। হাতা অর্থাৎ প্রাঙ্গন। ক্রমে ক্রমে এখানে জনবসতি গড়ে উঠলে এইস্থানের নাম হয়ে যায় হাতারপাড়া। তিনের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের শৈশবে বর্তমান হাতারপাড়া জার্মান কার্লেস্কার সার্কাসকে তাবু ফেলতে দেখেছি। আজ থেকে ১৬৭ বৎসর পূর্বে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কৃষ্ণনগর কলেজ নামে সরকারী অনুমোদন পেয়েছিল– হঠাৎই গত শতাব্দির নয়ের দশকের প্রথমদিকে জনৈকের এক কলমের খোঁচায় তার অতীত ইতিহাস মুছে দিয়ে, হয়ে গেল কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ। যদি কলেজের নাম পরিবর্তন একান্তই প্রয়োজন হয় তাহলে কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠায় যাঁর অবদান অনস্বীকার্য ও বেশী সেই বিদ্যোৎসাহী মহারাজা শ্রীশচন্দ্রর নামেই নামকরণ করা উচিত বলে মনে হয়। কলেজের মূল ভবনের মাথায় এখনও দেখা যায় লেখা আছে– KRISHNAGAR COLLEGE 1846 এবং তার নীচে MDCCCLVI

'Steadfastness or determination (धृतिः), patience (क्षमा), control of the mind (शमः), non-stealing (अस्तेयं), purity of mind, body and speech (शौचं), control of the senses (इन्द्रियनिग्रहः), an inquiring intellect (धीः), knowledge which leads to liberation (विद्या), truth in thought, word and deed (सत्यं) and controlling anger (अक्रोधः) – these ten are the marks of *dharma*'

মরণোত্তর দেহ ও চক্ষু দান একটি পবিত্র সামাজিক কর্তব্য

শ্রী স্বপন কুমার দত্ত (প্রাক্তন ছাত্র)

মৃত্যুই কি জীবনের শেষ? না পরেও কিছু আছে? স্বর্গ, নরক, পুন:জন্ম এসব নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ থাকলেও কোনোটাই বিজ্ঞান সম্মত ভাবে প্রমাণিত নয়। অনেকে বলেন মৃত্যুর পর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়। এখানে পঞ্চভূত মানে ভুত বা প্রেতাত্মা নয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ, ব্যোম । অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং মহাশূন্য। তবে যাই হোক দেহ বিনষ্ট করে ফেলা হয়। এটা মানুষের সংস্কার মাত্র। কিন্তু কেউ কি জানেন স্বর্গ বলে কিছু আছে কিনা এবং দেহ সৎকার এবং পারলৌকিক ক্রিয়াদি পালন করলেই আত্মা সেখানে যাবে? তবে এটা তো ঠিক, যে পার্থিব দেহ পৃথিবীতেই থাকবে।

কাজেই দেহ যখন যাবে না, তখন সংস্কারের বশে তা নষ্ট করে ফেলার কোনো যুক্তি নেই। সে জন্য যা আমাদের কাজে না আসলেও অন্যের বিরাট উপকারে আসে তা' দান করা একটি পবিত্র কর্তব্য। মানব দেহের অন্যতম মূল্যবান অঙ্গ হল চোখ। চোখ না থাকলে মানুষ অন্ধ হয়ে চরম অসহায় হয়ে পড়ে। পৃথিবীর মোট অন্ধ মানুষের ২০ শতাংশ ভারতবাসী। ভারতে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ দৃষ্টিহীন এবং তার মধ্যে ১০ লক্ষ মানুষ মরণোত্তর চক্ষুদানে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেতে পারেন। এখন মানুষ ক্রমশ সচেতন হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে প্রতিবছর প্রায় ১৫,০০০ লোক চক্ষু দান করেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য। প্রয়োজন প্রায় ১,০০, ০০০ চোখ। কাজেই মৃত্যুর পর যখন আর নিজের কাজে লাগবে না, তখন যন্ত্রনা বিহীন ভাবে চোখদুটি কোনো ও অন্ধ মানুষকে দিয়ে তার চোখের আলো যেমন ফিরিয়ে দেওয়া যায় তেমনি তার চোখের মাধ্যমে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকা যায়। তবে চোখ দান করার আগে কিছু প্রাথমিক করণীয় আছে।

১) মৃত্যুর পর মৃতদেহ যথাসম্ভব ঠান্ডা স্থানে রাখতে হবে। ২) চোখ দুটি ভেজা তুলা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

৩) যত দ্রুত সম্ভব মৃতদেহ কাছাকাছি মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। ৪) দ্রুত চক্ষুদান করতে আই ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করতে হবে। এজন্য কোনও আই ব্যাঙ্ক পূর্ব থেকেই অঙ্গীকার পত্র জমা দেওয়া ভালো।

মানব দেহের যে যে প্রত্যঙ্গ পুনরায় ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করা সম্ভব সেগুলি হল–

১) জীবিত অবস্থায় রক্ত (Blood), বৃক্ক (Kidney), যকৃত(Liver), চামড়া(Skin), অস্থি মজ্জা (Bone Marrow), সাধারণত মৃত্যুর ৩৫ মিনিটের মধ্যে বৃক্ক (Kidney) নিতে হয়। ২) সাধারণত মৃত্যুর চার ঘন্টার মধ্যে কর্ণিয়া (Cornea) , হাড়, চামড়া, কানের পর্দা, কানের হাড় নেওয়া হয়। ৩) মস্তিষ্ক মৃত্যু (Brain Death) হলে এই অবস্থায় হৃদযন্ত্রকে (কৃত্রিম উপায়ে) সচল রেখে ব্যবহার যোগ্য সকল অঙ্গ সংগ্রহ করা সম্ভব। যেমন হৃৎপিন্ড (Heart), ফুসফুস (Lung), অগ্ন্যাংশয় (Pancreas), যকৃৎ (Liver) , অস্থি মজ্জা (Bone Marrow) রক্ত, হার্টের ভালভ।

বিজ্ঞানের মূল বক্তব্য হল আগে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, পরে-সিদ্ধান্ত। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও প্রথমে অর্থাৎ রোগ নির্ণয় পরে চিকিৎসা । সেজন্য ডাক্তারী ছাত্রদের শব ব্যবচ্ছেদ একটি অবশ্যিক পাঠ্যক্রম। কিন্তু শবদেহের অপ্রতুলতার জন্য বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে এই ক্লাস করানো খুবই অসুবিধাজনক। অথচ ১৯৮৭ সালে মেডিকেল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া পাঠক্রমে নির্ধারিত আছে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে অন্তত দশটি করে শব ব্যবচ্ছেদ প্রত্যক্ষ করতে হবে এবং সম সংখ্যক Clinico Pathological conference (C.P.C.) তে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের দেশে বিশেষ করে , গ্রামাঞ্চলে এখনও পাশ করা ডাক্তারের যথেষ্ট অভাব। তাই অভিজ্ঞ ডাক্তার তৈরীতে মেডিক্যাল কলেজ গুলিতে মৃতদেহ দান করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনে মৃতদেহের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই মানুষের জীবন রক্ষার্থে এবং সু–চিকিৎসক গড়ে তোলার কাজে সংস্কার ভুলে, মরণোত্তর দেহ দানে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। মানুষ হিসাবে এটা যে আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

With Best Compliments form :

Dr. Ratnadeep Das

B.D.S (Kolkata)

ORAL & DENTAL SURGEON

SURADANI

DENTAL CLINIC

RCT, SCALING, CROWN, BRIDGE ETC.

Address :

3/1, Chunuripara Lane, Krishnagar, Nadia

(Near 'Akshoy Vidyapith School')

Contact No. : 09474479474 (Mob.)

03472-254646 (Resi.)

রঙ্গপ্রিয় দ্বিজেন্দ্রলাল

নির্মল সান্যাল (প্রাক্তন ছাত্র –১৯৫৬–৬০)

মৃত্যুর একশ' বছর পরেও দ্বিজেন্দ্রলাল আজও যে বাঙালির মনোজগত থেকে নিতান্তই অবস্মৃত হন নি তার কারণ তাঁর কালজয়ী নাটক, বিচিত্র ভাবাশ্রিত তাঁর অপূর্ব গানের সম্ভার এবং অতি অবশ্যই তাঁর হাসির গান। বাংলার সাহিত্য অঙ্গনে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবেশ ঘটেছিল কাব্যলক্ষ্মীর হাত ধরে। নিতান্ত বাল্যকাল থেকেই কবিতা রচনায় তাঁর প্রতিভা দ্যুতিমান হয়েছিল। একই সঙ্গে বিভিন্ন রসাশ্রিত গীত রচনায়ও তাঁর পারদর্শিতা এবং দক্ষতা সকলকে চমৎকৃত করে তুলেছিল। ১৮৮২ খৃঃ তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'আর্য্যগাথা ১ম ভাগ' প্রকাশিত হয় তাঁর সম্পর্কিত জেঠতুতো দাদা শরৎ কুমার লাহিড়ির (রামতনু লাহিড়ির পুত্র) উৎসাহ ও আগ্রহে। তিনিই স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালের ১২ বছর বয়স থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত রচিত গানগুলি স্থান পেয়েছিল। তখনও তাঁর কোনও কবিতা প্রকাশিত হয়নি একটি ছাড়া। 'কেবল "দেবঘরে সন্ধ্যা" নামক মৎপ্রণীত একটি কবিতা 'নব্যভারত' -এ প্রকাশিত হয়।' (দ্বিজেন্দ্রলাল– নাট্যমন্দির, শ্রাবণ ১৩১৭)।

পরবর্তীজীবনে সাহিত্যক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল অনন্য হয়ে ওঠেন তাঁর হাসির গানের জন্য। ১৮৯৯ খৃ: 'আষাঢ়ে' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে একটা সাড়া পড়ে যায়। হাস্যরসাশ্রিত এমন অভূতপূর্ব কবিতা বাংলায় এর আগে আর লেখা হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই লিখেছেন– বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাঙালা ভাষায় হাস্যরসাত্মক কবিতার অভাব পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে Ingoldsby Legends –এর অনুকরণে কতকগুলি হাস্য–রসাত্মক বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়া 'আষাঢ়ে' নামে প্রকাশ করি। আষাঢ়ে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালি পাঠক বুঝতে পারল যে বাঙলা সাহিত্যে একটি নূতন জিনিষ এসে পৌঁছেছে। পাঠক সমাজে একটা সাড়া পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ নিজে 'সাধনা' পত্রিকায় আষাঢ়ের একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছেন তাতে প্রশংসা এবং ত্রুটি বিচ্যুতির আলোচনা সবই আছে। রবীন্দ্রনাথ পুস্তকটির রচয়িতার নাম জানতেন না, কারণ, – 'লেখক তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, বাংলা পাঠক–সমাজে তাঁহার নাম গোপন থাকিবে না।' রবীন্দ্রনাথের এই নিশ্চয়তা অচিরেই বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রর হাসির গান ও ব্যঙ্গ কবিতা বাঙালি সমাজে এবং সাহিত্যে দুক্ষেত্রেই প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। বাংলা সাহিত্য এর আগে কবিতায় বা গানে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ এবং হাস্যরসের এমন উজ্জ্বল দীপ্তি কখনও আস্বাদন করেনি। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'এই লেখাগুলির মধ্যে যে সুনিপুণ হাস্য ও সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আছে তাহা শাণিত সংযত ছন্দের মধ্যে সর্বত্র ঝকমক করিতেছে।'

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে এত ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, হাস্য পরিহাসের অন্তর্লীন উৎস এল কোথা থেকে? প্রকৃত কৃষ্ণনাগরিক জন্মসূত্রেই রসিক হয়। একটা রসিক মন এবং ঠাট্টা তামাসা করবার ক্ষমতা নিয়েই সে জন্মায়– এমনই এই ভূমি এবং জলহাওয়ার গুণ। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে এই হাস্যপ্রিয়তা বা ব্যঙ্গবিদ্রূপের সূক্ষ্ম প্রয়োগচাতুর্য তাঁর জীবনের প্রথমার্ধে আমাদের তেমন কোথায়ওই চোখে পড়েনি। আষাঢ়ে গ্রন্থটি প্রকাশ পাবার আগে সাময়িক

পত্র পত্রিকায় তাঁর এমন কিছু কিছু কবিতা দিয়েই এই নূতন ধারার কবিতার শুরু। অন্তরের গভীরে অন্তর্লীন রঙ্গপ্রিয়তা না থাকলে রচনা বা সৃষ্টির মধ্যে তা প্রতিভাত হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিজেন্দ্র ছিলেন এমনই এক রসিক এবং রঙ্গপ্রিয় মনের অধিকারী যা থেকে সুযোগ পেলেই ঠিকরে বেরোত হাসি আর রঙ্গব্যঙ্গের ফোয়ারা। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু–বান্ধব, চেনা–পরিচিত এমনকি অনেকক্ষেত্রে অপরিচিত ব্যক্তিরাও তাঁর রসিকতা এবং পরিহাসের ফলে লজ্জায় এবং সঙ্কোচে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন। অথচ, বাল্যকালে তিনি গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন– যৌবনের পরে তাঁর পরিহাস প্রিয়তা এবং রহস্যপটুতা ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্যবন্ধু বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন–'যিনি এ যুগের হাস্যরসে অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন তাঁহার যে কিছুমাত্র পরিহাস করিবার প্রবৃত্তি ছিল... তাহা তাঁহার বাল্যকালে কেহ লক্ষ্য করিতে পারে নাই।'

তবে পরিহাসপ্রিয়তার ঝোঁক যে ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে ফল্গুধারার মতো বহমান ছিল তার দু-একটা নমুনা ইতস্তত চোখে পড়ে। যেমন, দ্বিজেন্দ্র যখন ইস্কুলের নীচু ক্লাসে পড়েন তখন একদিন তাঁর কলেজে পাঠরত দাদা সুরেন্দ্রলালের সঙ্গে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির বিখ্যাত বারোদোল মেলা দেখতে যাচ্ছিলেন। পথে যেতে যেতে সুরেন্দ্রলাল রঘুবংশ ও ভাট্টকাব্য থেকে শ্লোক আওড়াচ্ছিলেন। পথচারীরা অবাক হয়ে তা লক্ষ্য করছে দেখে দ্বিজেন্দ্রের মনেও ইচ্ছা হল অগ্রজের মতো সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতে। তেমন কাব্যশ্লোক তাঁর কিছু জানা না থাকায় তিনি উচ্চকণ্ঠে সংস্কৃত শব্দরূপ ও ধাতুরূপ আবৃত্তি করতে করতে দাদার সঙ্গে চলতে লাগলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রিয়তম অগ্রজ হরেন্দ্রলাল যাঁকে দ্বিজেন্দ্রলাল রাঙ্গাদাদা বলে ডাকতেন তাঁর স্ত্রী মোহিনীদেবী তাঁর লেখায় দ্বিজেন্দ্রর এই রসিকতার একটি নমুনা পেশ করেছেন। মোহিনীদেবীর যখন বিয়ে হয় দ্বিজেন্দ্র তখন বিলেতে। তিনি বিলেত থেকে প্রায় আড়াই বছর পরে বাড়িতে যখন ফিরছেন তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করবার জন্য সারাবাড়ি জুড়ে হৈ হৈ পড়ে গিয়েছে। পরিচিত সকলের সঙ্গে কথাবার্তা হবার পর অপরিচিতা নতুন বৌ রাঙ্গাবউদির সঙ্গে পরিচয়ের পালা। 'রাঙ্গাবউর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তারপর, ভাল আছেন?' সেই নূতন লোক রাঙ্গাবউ ভয়ে লজ্জায়, আরও রাঙ্গা হইয়া উঠিয়া বলিলেন, 'হাঁ আপনি ভাল আছেন?' কবির উত্তর বা রসিকতা এই প্রথম দিন, 'আম্রতলায় দুজনেতে বহুৎ কথা আছে।' নূতন বৌ এই রসিকতার ধাক্কায় আরও সলজ্জ এবং ব্রীড়াবনত হয়ে পড়লেন। অন্য সবার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রও হেসে উঠলেন সরবে।

মোহিনী দেবীর লেখায় হাস্যপরিহাস এবং রঙ্গ প্রিয়তার বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। সাধারণ কথাবার্তার মধ্যেও দ্বিজেন্দ্রের রহস্য ও পরিহাস সর্বদাই যেন ঠিকরে বেরোত। মোহিনী দেবী লিখেছেন, বিলাত হইতে তাঁহার একটি মিউজিক্যাল বক্স আসিয়াছিল, সেই অর্গানের সঙ্গে বাজনার তালে তালে নাচিতে হইবে। সব বধূদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আসুন, আপনাদের শিখাইব আমি কেমন নাচিতে শিখিয়াছি; সেইরকম কিন্তু নাচিতে হইবে' তখন একটা লজ্জাজনিত মহাহাস্য কলরব উত্থিত হইল।' একমাত্র ভ্রাতৃকন্যা ঊষা তাঁহার নাচের সঙ্গী হইল। দ্বিজেন্দ্রর তখনও বিয়ে হয় নি, কথাবার্তা চলছে। কিন্তু অন্দরমহলে বাড়ির বউদের ও আত্মীয়াদের সঙ্গে এমন রঙ্গরসিকতায় তিনি ছিলেন অকপটভাবে সরল ও প্রাণবন্ত।

শ্রীরামপুরের গোস্বামী বাড়ির প্রসাদদাস ছিলেন সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের দাদাশ্বশুর কিন্তু তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বের ভাবই ছিল প্রধান । দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁকে দাদামশাই বলে ডাকতেন যেহেতু তিনি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রপত্নী সুরবালার দিদিমার ভাই। সেই সূত্রে দ্বিজেন্দ্রর সব বন্ধুবান্ধবই প্রসাদদাসকে দাদামশাই বলে সম্বোধন করতেন। তিনি ছিলেন সরকারী দাদামশায়। প্রসাদদাস লিখেছেন, বিবাহের দু' একদিন পরে দ্বিজ সস্ত্রীক আমার সহোদরার সহিত (সুরবালার মাতামহীর সহিত) শ্রীরামপুরে আমার মাতাঠাকুরানী ও স্ত্রীকে প্রাণাম করিতে যায়। সেদিন দ্বিজুর এক অপূর্ব, হাস্যোদ্দীপক মূর্ত্তি। আগাগোড়া লাল মকমলের পোষাক, ছোট প্যান্ট, হাফকোট, একটা গোরাই ধরণের ক্যাপ বা টুপি মাথায়। সব টকটাক লাল। দু'একটা তামাসা করিতে ছাড়িলাম না; নাতজামাই, ছাড়িব কেন?

এই বিবরণ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে রঙ্গপ্রিয়তা ছিল তাঁর শোণিতে মজ্জায়। নইলে নতুন জামাই প্রথম শ্বশুর সম্পর্কিত কুটুম্বদের বাড়ি যাচ্ছেন ওই পোষাক পরে! নিজেকে নিয়েও তিনি রঙ্গ করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না, এ ঘটনা থেকে তা পরিস্ফুট হয় সহজেই।

ঠিক একই ধরণের রঙ্গকীর্ত্তির আর একটি নমুনা দিয়ে লিখেছেন– প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) বড় দিদি প্রসন্নময়ী দেবী। দ্বিজেন্দ্রলাল সদ্য চাকরীতে যোগ দিয়েছেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে। সার্ভে এবং জমাবন্দীর কাজে প্রশিক্ষণের জন্য সরকার তাঁকে মধ্য প্রদেশের রায়পুরে পাঠান। সেখানে তিনি তাঁর সেজদা জ্ঞানেন্দ্রলালের সহপাঠী বন্ধু রায়বাহাদুর তারাদাসবাবুর কাছে ছিলেন। প্রসন্নময়ী দেবীর বিবরণে জানা যায় – সেখানে এক দরবার হয়। দ্বিজু সেই দরবারে ধুতি, চাদর, লাল কোট ও বিলাতী হ্যাট পরিয়া সভায় গিয়া হাজির হন। সভাস্থ সকলে তাঁহার এই অদ্ভুত বেশ দেখিয়া তো একেবারে অবাক! কমিশনার সাহেব তাই দেখিয়া তারদাসবাবুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকটা কি পাগল? নইলে এইরূপ পোষাকের অর্থ কি? তাহাতে তারাদাসবাবু বলিয়াছিলেন– খেয়ালী লোক, পাগল নহে। অতিশয় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান.. কাজে ক্রমশ তাহা প্রকাশ পাইবে। এই অদ্ভুত দিশী ও বিলাতী পোষাকের সমন্বয় ঘটিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল এই দুই জাতির মিলনের বার্তা দিতে চেয়েছিলেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েও রহস্য ও রঙ্গ প্রিয়তা তাঁর মধ্যে এতটুকু হ্রাস পায়নি।

আর একটি এমনই উজ্জ্বল পরিহাসের কথা কবিপুত্র দিলীপকুমার বিবৃত করেছেন তাঁর বইতে। দ্বিজেন্দ্রলল তখন গয়ায় ডেপুটি কালেক্টর। স্থানীয় জমিদারবাবু এসেছেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। অতিথিকে চা পরিবেশন করা হলে তিনি চা খান না বলে জানিয়েছিলেন। এই শুনে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কাছে এসে খুবই উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলেন : You don't take tea? এই প্রশ্ন শুনে সেই জমিদারপ্রবর কি করবে ভেবে না পেয়ে আর কালেক্টর সাহেবের গম্ভীর মুখ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে স্রেফ কুর্ণিশ করে ফেলল, বলল: No Sir! দ্বিজেন্দ্রলাল তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলে উঠলেন : But you look like a gentleman! এই কথার অর্থ সেই জমিদারবাবু কি বুঝেছিলেন আমরা জানি না কিন্তু দিলীপকুমারের এই বর্ণনা পরিহাস উজ্জ্বল চকচকে চোখমুখের দ্বিজেন্দ্রলালকে আমাদের সামনে নিখুঁত ভাবেই তুলে ধরে। তাঁর ঠোঁটের কোণের মুচকি হাসিটুকুও যেন চোখের ওপর ভেসে ওঠে।

দ্বিজেন্দ্রলালের রঙ্গপ্রিয়তার আর একটা নমুনাও দিলীপকুমারের 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থ থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলালের শ্যালকপত্নী অর্থাৎ সুরবালা দেবীর বৌদির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের খুবই সুমধুর সম্পর্ক ছিল। নতুন গান রচনা করে মাঝে মাঝেই তিনি গিয়ে শুনিয়ে আসতেন তাঁকে। এমনই এক ঘটনার কথা দিলীপকুমার তাঁর বড় মামীমার জবানীতে আমাদের শুনিয়েছেন। তখন দিলীপ খুবই ছোট, বড় হয়ে শুনেছেন তাঁর মামীমার মুখে–'কখনো হঠাৎ নাচের সাধ হল। আমরা সব দোর বন্ধ করে দিলাম। আমার তিন চারটি ননদ, গিরিশদা ও দ্বিজদার ঘোমটা পরে নৃত্য। সে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।' ভাবা যায়! দ্বিজেন্দ্রলালের মতো একজন খ্যাতিমান মানুষ, সরকারের একজন উচ্চপদস্থ রাশভারী কর্মচারী মাথায় ঘোমটা দিয়ে গান গেয়ে নেচে যাচ্ছেন মনের আনন্দে। এমনই ছিল তাঁর রঙ্গপরায়ণ মনের স্ফুর্তির প্রকাশ।

সুযোগ পেলেই রস- রসিকতা পরিবেশনে দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বদাই ছিলেন উন্মুখ। কোনো একটা কারণে একটা ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। আমন্ত্রিত ছিলেন তখনকার বহু গণ্যমাণ্য বিখ্যাত ব্যক্তিরা এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবরা। নিজের ক্ষুদ্র বাড়িতে স্থান সঙ্কুলান হবে না বলে এই আয়োজন হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের শ্বশুর বাড়িতে। আমন্ত্রণকর্তা ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, সুরবালা দেবী এবং দ্বিজেন্দ্রশ্যালক জিতেন্দ্রনাথ। এই উপলক্ষে রচিত আমন্ত্রণপত্রখানির প্রতি ছত্রে দ্বিজেন্দ্রকৌতুক যেন ফুটে বেরোচ্ছে। পত্রখানির বয়ানটি উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা গেল না। পত্রটিতে লেখা হয়েছিল– 'যাঁহার কুবেরের ন্যায় সম্পত্তি, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি, যমের ন্যায় প্রতাপ– এ হেন যে আপনি, আপনার ভবনের নন্দন কানন ছাড়িয়া, আপনার পদ্মপলাশ–নয়না ভামিনী সমভিব্যহরে, আপনার স্বর্ণ- শকটে অধিরূঢ় হইয়া, এই দীন, অকিঞ্চিৎকর, অধমদের গৃহে , 'শনিবার মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্নে আসিয়া যদি শ্রীচরণের পবিত্র ধুলি ঝাড়েন– তবে আমাদের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়। ইতি

প্রসঙ্গত, এই অদ্ভুত আমন্ত্রণপত্রের প্রাপকদের অনেকেই পত্রের উত্তর দিয়েছিলেন। তার মধ্যে দুখানি জবাবী পত্র দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও দ্বিজেন্দ্রজীবনীকার দেবকুমার রায় চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এই সুযোগে জবাবদুটিও দেখে নেওয়া যেতে পারে। বিখ্যাত শিকারী এবং প্রমথ চৌধুরীর অগ্রজ ব্যারিষ্টার কুমুদ চৌধুরী লিখেছেন–

ডানাকাটা পরী / গাঁজা–গুলি আব্‌করী / হোমো পেত্নী ধন্বন্তরী /

–ত্রয়ে নমস্করী! / এত কহে পায়ে ধরি / শ্রীকুমুদ চৌধুরী।।

এই লেখায় ডানাকাটা পরী হচ্ছেন সুরবালা, দ্বিজেন্দ্রলাল তখন আবগারী ইনপেক্টর তাই গাঁজাগুলি আর জিতেন্দ্রনাথও ছিলেন পিতা প্রতাপচন্দ্রের মতই হোমিওপ্যাথ ডাক্তার তাই হোমো– পেত্নী–ধন্বন্তরী!

অপর চিঠিটি ছিল রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের। তিনি লিখলেন–

ন চ সম্পত্তি ন বুদ্ধি বৃহস্পতি, যম প্রতাপ চ নাহিক মে।

ন চ নন্দন- কানন স্বর্ণ সুবাহন, পদ্ম বিনিন্দিত পদ যুগ মে।

আছে সত্যি পদ রজ রত্তি তাও পবিত্র কি জানিত নে।

চৌদ্দ পুরুষ তব ত্রাণ পায় যদি, অবশ্য ঝাড়িব তব ভবনে।।

কিন্তু–

মেঘাচ্ছন্নে শনি অপরাহ্নে গুরু বার্ধা না ঘটে মে।

কিম্বা যদ্যপি সহসা চুপি চুপি প্রেরিত না হই পরধামে।।

দ্বিজেন্দ্র রঙ্গচ্ছটাপূর্ণ আর একটি কৌতুকময় পত্রের নমুনা দেবকুমার তাঁর গ্রন্থে সংযোজন করেছেন। জনৈক কর্মপ্রার্থী আত্মীয়ের জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল এই সুপারিশ পত্রটি পাঠাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। তখন রবীন্দ্র দ্বিজেন্দ্র সখ্যতার যুগ। সুপারিশ করে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখছেন,

'শুনছি নাকি মশায়ের কাছে
অনেক চাকরি খালি আছে,
দশ বিশ টাকা মাত্র মাইনে।
দু'একটা কি আমরা পাইনে?
ইন্দুভূষণ সান্যাল নাম
আগ্রাকুন্ডা গ্রাম ধাম,
–চাপড়া গ্রামের অপর পারে।
এক্কেবারে নদীর ধারে।
নাই বা থাকুক টাকাকৌড়ি
– চেহারাটা লম্বা চৌড়ি।
কুলীন ব্রাহ্মণ, মোটা পৈতে,
ইংরেজিটাও পারেন কৈতে।

পাবনা কোর্টের প্রধান প্লীডার

গণ্যমান্য বারের লীডার–

প্রতাপ রায় হন ইঁহার শ্বশুর,

এতেই মাপ এঁর হাজার কশুর।। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই রঙ্গচ্ছন্দেভরা কৌতুকলেখাগুলির মধ্যে আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তর্লীন হাস্যকৌতুকভরা স্বরূপটা সহজেই অনুভব করতে পারি।

শুধুমাত্র লেখালেখি ও আচার আচরণেই নয় দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যবহারিক কৌতুকেও, যাকে বলে প্র্যাকটিক্যাল জোক, সমান উৎসাহী ও তৎপর ছিলেন। তারও অনেক নমুনা দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীগ্রন্থের নানা অধ্যায়ে ছড়িয়ে আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নিত্যসহচর দাদামশাই মাঝে মাঝেই তার শিকার হতেন। দু–একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে, পারে এই প্রসঙ্গে। যেমন, একদিন গ্রীষ্মের দিনে দ্বিজেন্দ্রলালের বাড়িতে বন্ধুবান্ধরা গল্পগুজব করছেন। দাদামশাইও উপস্থিত আছেন। হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের ইসারায় একজন বলে উঠলেন, একি, দাদামশাইয়ের যে শীত করছে। সকলে বলে উঠলেন, তাই তো, লেপ চাপা দাও; লেপ চাপা দাও। লেপ প্রস্তুতই ছিল–লেপের তলা চাপা পড়ে দাদামশাই– এর একেবারে গলদঘর্ম অবস্থা।

আর একদিন বন্ধুবান্ধবসহ সময় কাটানোর ফাঁকে দ্বিজেন্দ্রলাল বলে উঠলেন, আজকের এমন দিনটা মিছে কেটে যাচ্ছে, কি করা যায় বলুন দেখি। একজন বললেন, আজ দাদামশায়ের দাড়িতে কলপ দেওয়া যাক। দ্বিজেন্দ্রলাল মহা উৎসাহে বাড়ির এক পরিচারককে ডেকে সব শিখিয়ে দিলেন। সে একটা শিশিতে জল পুরে কাগজে মুড়িয়ে নিয়ে বলবে, বোস কোম্পানির দোকান থেকে আসছি। দাদামশাই অকুস্থলে প্রবেশ করার পর সেই পরিচারক, পূর্বশিক্ষামত শিশিহাতে মঞ্চে ঢুকে তার সংলাপ বলল যথারীতি। সবাই সোৎসাহে দাদামশায়কে চেপে ধরার উপক্রম করতে নিজের শ্বেতশুভ্র দাড়ির মায়ায় আক্ষরিক অর্থেই সেখান থেকে ছুটে পালালেন দাদামশাই।

এই বন্ধুবান্ধবদের হাতে পড়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেও একবার প্র্যাকটিক্যাল জোকের শিকার হয়েছিলেন। সে ঘটনার কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই বোধ হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল স্ত্রীবিয়োগের পর নিতান্তই উদাসীন ও অন্তর্মুখী হয়ে পড়েন। নিতান্তই শিশু দুই পুত্রকন্যাকে নিয়ে তখন তাঁর জীবনে ক্রমশই অসহায় ও দুঃখবাদী হয়ে পড়ছিলেন। পরে কলকাতায় এসে নিজের বাড়ি সুরধামে বসবাস করতে শুরু করেন ১৯০৮ সাল থেকে। এই সময়েই তিনি তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলি রচনা করেন এবং তাঁর নাটকের অভিনয় উপলক্ষে রিহার্সাল ও গান শেখানোর জন্য নিয়মিত রঙ্গালয়ে যেতেন। পত্নীবিয়োগের পর থেকেই পুনরায় বিবাহ করবার জন্য তাঁর ওপর একটা চাপ নানাদিক থেকেই ছিল। কিন্তু প্রিয়তমা পত্নীকে দেওয়া কথা অনুযায়ী তিনি দ্বিতীয় বিবাহ কখনই করেন নি। নিজের বাড়ির একতলাতেই নিজের প্রতিষ্ঠিত ইভনিং ক্লাবকে স্থাপন করেছিলেন। সেখানে নিয়মিত তাস বিলিয়ার্ড প্রভৃতি

খেলা হত এবং সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে নানাবিধ আলোচনা তর্কবিতর্ক, রঙ্গ পরিহাস ইত্যাদি চলত। পত্নীবিয়োগের পর পুনরায় বিবাহ করবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের ওপর নানাভাবে তাঁর নিকটজনেরা বেশ চাপ সৃষ্টি করছিলেন। তখন তিনি সুকিয়া স্ট্রীটের ভাড়াবাড়িতে বাস করেন। সেই সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁর একটি শিক্ষিতা বিধবা কন্যার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বিবাহ দেবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সেই কন্যার সাক্ষাৎ পরিচয়ও করিয়ে দেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এই সাক্ষাৎকারকে সমূহ বিপদ মনে করে তার থেকে উদ্ধার পাবার জন্য নিতান্তই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। এইরকম একটা সময়ে দ্বিজেন্দ্রের বন্ধুরা তাঁকে নিয়ে তামাশা করবার উদ্দেশ্যে কোন মহিলার হস্তাক্ষরে লেখা একটি উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতা তাঁর হাতে পৌঁছে দেন। সেই পত্রে লেখিকা দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন এমন ইঙ্গিতও ছিল। সেই লেখা হাতে পেয়ে দ্বিজেন্দ্র যারপরনাই উদ্বিগ্ন এবং অস্থির হয়ে ওঠেন। কি করে এই বিড়ম্বনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় সেই দুশ্চিন্তা তাঁকে গ্রাস করে। কারণ, তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে সেই বিধবা কন্যাটিই এই পত্রের লেখিকা। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, পত্রে লিখিত দিন ও সময়ে তিনি বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে থাকবেন। সত্যিসত্যিই সেই নির্দিষ্ট দিনে তিনি যখন অন্যত্র চলে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন তখন তাঁর বন্ধুরা এই পত্রের রহস্য ফাঁস করে তাঁকে নিরস্ত করেন। দ্বিজেন্দ্রলালও হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের রঙ্গপ্রিয়তা মৃত্যুদিন পর্যন্তও তাঁর সঙ্গী ছিল। জীবনের শেষ দিনেও তার পরিচয় তিনি রেখে গিয়েছেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর দিন (১৭মে, ১৯১৩) সন্ধ্যায় তাঁর নিত্যসহচর দাদামশাইয়ের সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম নাটক দেখতে যাবার কথা ছিল। তাঁর আর এক অন্তরঙ্গ সুহৃদ বিজয়চন্দ্র মজুমদার সেদিন তাঁর বাড়িতে অতিথি ছিলেন। সেদিনই সন্ধ্যায় বিজয়বাবু সম্বলপুর ফিরে যাবেন ট্রেন ধরে। দ্বিজেন্দ্রলালের ইচ্ছা ছিল বিজয়বাবু সেদিনটা থেকে তাঁদের সঙ্গে নাটক দেখে পরের দিন যেন যান। এই মর্মে তিনি বিজয়বাবুকে অনেকবার অনুরোধ করেন। কিন্তু বিজয়বাবু তাতে রাজী হন না। তখন দ্বিজেন্দ্রর দুষ্টুবুদ্ধি জেগে উঠল। তিনি দাদামশাইয়ের সঙ্গে গোপন পরামর্শ করে তাঁকে বল্লেন, এক কাজ করা যাক, আজ নানাবিধ গল্প করে গল্পে গল্পে বিজয়কে ট্রেন ফেল করিয়ে দি। সেইরকম চেষ্টাও হল পরিকল্পনা অনুযায়ী। কিন্তু চেষ্টা সফল হল না। বিজয়বাবুকে আটকে রাখা গেল না। কিন্তু এটা আমরা এর থেকে বুঝতে পারলাম যে , হাসি ঠাট্টা রঙ্গ মজা করবার যে অফুরন্ত উৎস দ্বিজেন্দ্রলালের সরস অন্তরের অন্তঃস্থলে আজীবন সক্রিয় ছিল, মৃত্যুর মাত্র কয়েকঘন্টা আগেও রঙ্গপ্রিয়তার সেই উৎস শুকিয়ে যায় নি।

(এই নিবন্ধটি রচনায় মোহিনী দেবী, নবকৃষ্ণ ঘোষ, দেবকুমার রায় চৌধুরী, দিলীপকুমার রায় ও সুধীর চক্রবর্তীর নানা রচনা থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।)